খাওয়ার আদব

জাষ্টিজ মাওলানা তাকী উসমানী

খাওয়ার আদব

হযরত মাওলানা তকী উসমানী (দা.বা.)
সাবেক বিচারপতি, শরীয়া কাউন্সিল, পাকিস্তান

অনুবাদ
মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন বক্সী

পরিবেশনায়
এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দু'টি কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

'খাওয়ার আদব' বইটিতে শুধু খাওয়ার আদবই বর্ণিত হয়নি; বরং তাতে মুসলমানদের জীবনযাপনের বেশকিছু জরুরি বিষয়াদিও বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি উর্দু কিতাবের বঙ্গানুবাদ। আর আমরা এই অনুবাদ কর্মটি সম্পন্ন করেছি শুধু এই কারণে যে, এতে সন্নিবেশিত কতিপয় তথ্য আমাদের অজানা। সত্যি বলতে কি, এগুলো বিনা তাহাকীকেই সাধারণ্যে যুগ যুগ ধরে আমল হয়ে আসছে।

মাওলানা ত্বকী ওসমানীর লিখনীতে যখন তা উদ্ভাসিত হলো, তখন ভাবলাম, এখনই তা বাংলা ভাষায়ও প্রকাশিত হওয়া চাই। যাতে সাধারণ পাঠকবর্গ তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করতে পারেন এবং আলিম সমাজও পারেন তথ্য ও তত্ত্ব খুঁজে বের করতে। এভাবেই আশা করা যায়, 'সঠিক' ও 'বেঠিক' দিবসের আলোর মতো পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

মাওলানা ত্বকী ওসমানী (দাঃ বাঃ) বর্তমান এলমী দুনিয়ার একটি নক্ষত্র। তিনি সকলের কাছে সমভাবে বরেণ্য ও মান্য। সুতরাং পুস্তিকায় সন্নিবেশিত বিষয়াদির ব্যাপারে আমরা আপাতত দায়মুক্ত। তবে হ্যাঁ, অনুবাদ কর্মের ত্রুটির দায়ভার আমরাই বহন করব। তবে হৃদয়বান পাঠকবর্গের উদারতায় ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমরাও হয়ে উঠব পরিশোধিত ও পরিমার্জিত।

বিজ্ঞ পাঠকবর্গের সমীপে আমাদের আরজ, আপনারা বইটির আগাগোড়া পড়ে নিন; তাতে আশা করা যায় হৃদয়ে সুন্নতের গুরুত্ব ও তার প্রতি আগ্রহ বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

মূল উর্দু বইটি পেয়েছি তাবলীগ জামাতের মান্যবর জেলা আমীর হযরত মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব (দাঃ বাঃ)-এর কাছ থেকে। একদিন তিনি বইটির অংশবিশেষ পড়ে শুনাচ্ছিলেন সাথীদের। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ থানীপাড়ার শামীম ভাই বলে উঠল, বাংলা ভাষায় বইটি অনূদিত হলে আমরাও আজ তা থেকে উপকৃত হতে পারতাম। শামীম ভাইয়ের মনের আবেগ আমাকে দারুণভাবে আলোড়িত করল। সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের কাছ থেকে বইটি নিয়ে তরজমা শুরু করলাম। এক সপ্তাহে তা সমাপ্ত হলো।

বন্ধুবর মাওলানা মামুনসহ আরো কতিপয় আলেমের সঙ্গে বিষয়বস্তু ও অনুবাদ নিয়ে কিছু পর্যলোচনা করার পর আমার মেঝ ভাই মেজর শামীম সাহেবের উৎসাহে বইটি মুদ্রণের কাজে হাত দিলাম। আল্লাহ তাদের সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আশা-নিরাশার দোলাচলে বইটি নিয়ে আজ পাঠকবর্গের খেদমতে উপস্থিত হলাম। এখন আল্লাহর সমীপে সেজদায়ে শোকর আদায় করছি ও ভিক্ মাগছি, যেন তিনি এ সবকিছু কবুল করে নেন ও আখিরাতের প্রয়োজনে আমাদের জন্য তা সংরক্ষণ করে রাখেন।

–অনুবাদক

Contents

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

Contents

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

Contents

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ : عَنْ عَمْرِوبْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاغُلاَمُ اِسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ (رواه البخارى)

দ্বীনের পাঁচ বুনিয়াদ

আমি পূর্বেও পাঠকবৃন্দের খেদমতে একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে, আমাদের উপর আরোপিত দ্বীন ইসলামের বিধানাবলী পাঁচ প্রকার। যথা- আকাঈদ, ইবাদত, মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক। গোটা দ্বীন এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে দ্বীন অপূর্ণ হয়ে পড়ে।

সুতরাং ঈমান-আকীদাও ঠিক হওয়া চাই; এবাদত-বন্দেগীও সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়া চাই। লেন-দেন ও বেঁচা-কেনার নিয়মাবলী শরীয়তসম্মত হওয়া চাই। সাথে সাথে স্বভাব-চরিত্রও ভালো হওয়া চাই। সর্বোপরি, জীবনযাপনের নিয়ম-পদ্ধতিও সঠিক হওয়া চাই। এই শেষোক্তটারই নাম মু'আশারাত।

এ যাবৎ আখলাকের আলোচনাই সর্বাধিক পরিমাণে হচ্ছিল। এরই মাঝে ইমাম নববী (রহঃ) এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন, যাতে দ্বীনের এমন সব হাদীস ও রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হলো, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে

মু'আশারাত। একে অপরের সাথে জীবনযাপন করতে যেসব নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আদব-কায়দার প্রয়োজন হয়, তারই নাম মু'আশারাত। অর্থাৎ জীবনযাপনের সঠিক নিয়ম-কানুন, খানাপিনার আদব-কায়দা, ঘরে বসবাস, বাইরে চলাচল এবং মানুষের সাথে কথাবার্তা, উঠাবসা ইত্যাদির প্রত্যেকটিই মু'আশারাতের অন্তর্ভুক্ত।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলতেন, “এ যুগে লোকজন মু'আশারাতকে তো একেবারে দ্বীনের বহির্ভূত বিষয়ে পরিণত করে রেখেছে। এ ক্ষেত্রে তারা দ্বীনের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে। এমনকি যাদের নামায-রোজা পাকা, তাহাজ্জুদ কখনো ছুটে না, তেলাওয়াত-তাসবীহাত ও জিকির-আজকার নিয়মিত; তাদের মু'আশারাতও আজ শরীয়তবহির্ভূত। যার ফলে তাদের দ্বীন অঙ্গহীন, অপূর্ণ।”

এ কারণেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সাঃ) বিধৃত বিধানাবলী ও শিক্ষাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হয়ে গুরুত্বসহকারে আমল করা জরুরি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

নবীজি (সাঃ) সব কিছু শিখিয়ে গেছেন

মু'আশারাতের অধ্যায়ে ইমাম নববী (রহঃ) সর্বপ্রথম 'খাওয়ার আদব' বর্ণনা করেছেন। নবীজি (সাঃ) যেভাবে মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রেখে গেছেন, সেভাবে খানাপিনার বিষয়েও তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

একদা এক মুশরিক ইসলামের বিপক্ষে মন্তব্য করে সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-কে বললেন, “তোমাদের নবী দেখি তোমাদের একেবারে (ছোটখাট) সবকিছুরই শিক্ষা দিয়ে থাকেন; এমনকি পেশাব-পায়খানার নিয়ম-পদ্ধতিও।”

লোকটার উদ্দেশ্য ছিল খুঁত ধরা। অর্থাৎ পেশাব-পায়খানার কথাও কি কেউ কাউকে বলে দেয়? এটাও কি আবার শিক্ষাদানের বিষয়? লোকটার ধারণা ছিল, এতো এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, নবী ও পয়গম্বরের ন্যায় কোনো সুমহান ও বিরাট ব্যক্তিত্বেরও এ বিষয়ে কথা বলতে হবে!

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) লোকটিকে বললেন, দেখো, তুমি যে বিষয়টাকে লজ্জার বস্তু মনে করেছে, তা আমাদের কাছে ফখর ও গর্বের

বিষয়। অর্থাৎ তিনি আমাদের এমনই দরদি নবী, যিনি আমাদের পেশাব-পায়খানার রীতিনীতিও শিখিয়ে গেছেন, যাতে আমরা (পুতপবিত্র) কিবলার দিকে বসে তার অপমান না করি; ডান হাতে ঢিলা-কুলুপ ও পানি ব্যবহার করে বে-আদব না হই। একেবারে একজন আদর্শ ও দয়াদ্র মাতা-পিতার অনুরূপ।

স্মরণীয় যে, কোনো মাতা-পিতা যদি লজ্জা ও সংকোচবশত সন্তানকে সুশিক্ষাদানে বিরত থাকে, তথা পেশাব-পায়খানার মতো যাবতীয় ছোটখাটো ও গোপনীয় বিষয়াদির শিক্ষাদান বর্জন করে বসে, তাহলে তারা জীবনভরই এসব বিষয়াদির সঠিক নিয়ম পালন করতে অক্ষম থেকে যাবে। আর আমাদের নবীজি (সাঃ) আমাদের বাবা-মা'র তুলনায় শতগুণ বেশি স্নেহশীল ও দয়ালু ছিলেন।

ফলে তিনি খুঁটিনাটি সবকিছু শিখিয়ে গেছেন। খানাপিনার নিয়ম-তরিকা এ সবের অন্যতম। খানাপিনার বিষয়ে তিনি আমাদের এমন সব বিধি-নিষেধ জানিয়ে গেছেন, যার ফলে তা এবাদতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা প্রতিদান ও বিনিময়ের উপলক্ষ্য হয়ে গেছে।

খাওয়ার তিন আদব

হযরত আমর বিন সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ) আমাকে হুকুম করেছেন, "খানা খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করো। অর্থাৎ 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে খাওয়া আরম্ভ করো। ডান হাতে খাও এবং বরতনের ঐ অংশ থেকে খাও, যা তোমার নিকটবর্তী। হাত বাড়িয়ে অপরের দিক থেকে খেও না।"

এই হাদীসটিতে খাদ্য গ্রহণের তিনটি আদব সুস্পষ্ট। প্রথম আদব 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে আরম্ভ করা। অপর হাদীসে হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, "হুজুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন খানা খেতে শুরু করে, তখন যেন সে আল্লাহর নাম নেয়। আর কেউ যদি 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা ভুলে যায় এবং পরে খানা খাওয়ার মাঝে স্মরণ হয়, তখন যেন সে 'বিস্‌মিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' বলে।" (আবু দাউদ)।

অর্থাৎ– শুরুতে বা শেষে সর্বসময় আমরা আল্লাহরই নাম জপি; অন্য কারো নয়।

শয়তানের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করি

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবীজি (সাঃ) এরশাদ করেন, "কোন ব্যক্তি যখন নিজ ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে এবং খাওয়ার সময়ও আল্লাহর নাম নেয়; তখন বিতাড়িত শয়তান তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ডেকে বলতে থাকে, এই ঘরে তো তোমাদের রাত যাপনের কোনো সুযোগ নেই। কেননা, ঘরের মালিক তথায় প্রবেশকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছে এবং খাওয়ার সময়ও তারই নাম নিয়েছে। ফলে এখানে রাত যাপনের আশার গুঁড়ে বালি। আর খানা খাওয়ার ব্যবস্থাও ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, কোনো ব্যক্তি যখন নিজ ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে সরাসরি ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন শয়তান তার সঙ্গীদের বলতে থাকে, চলো ভাই চলো! তোমাদের অবস্থান গ্রহণের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে, তোমাদের রাত যাপনের এন্তেজামও হয়ে গেছে। কেননা, এখানে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি। আর লোকটি যখন খেতে বসেও আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, তখন শয়তান সাথীদের বলতে থাকে, তোমাদের খানাপিনার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।" (আবু দাউদ)।

মোটকথা, হাদীসটি থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, আল্লাহর নাম না নিলে শয়তানের অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, শয়তানের এহেন অনুপ্রবেশের অনিবার্য ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, সে ঘরওয়ালাদের বিভিন্নভাবে ফুস্‌লাতে ও প্ররোচিত করতে থাকে। গোনাহ ও অবৈধ কাজে আকৃষ্ট করতে থাকে। মন-মগজে বাজে খেয়াল ও ওস্‌ওয়াসা দিতে থাকে। দ্বিধা-সংকোচ ও মনের দুর্বলতা সৃষ্টি করে। আর খানাপিনার মধ্যে শয়তানের জন্য সুযোগ হয়ে যাওয়ার ফল দাঁড়ায় যে, আমাদের গৃহীত খাদ্যে আর কোনো বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় না। বড়জোর রসনা-তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু ঐ খাদ্যে কোনো নূর ও বরকত থাকে না।

ঘরে প্রবেশের দু'আ

উপরে বর্ণিত হাদীসটিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দু'টি বিষয়ের তাকিদ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে– ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহর নাম নেয়া। আর এ ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত নবীজির মোবারক মুখ- নিঃসৃত

দু'আটি উচ্চারণ করাই সর্বাধিক সুন্দর হবে বলে মনে করি। হুজুর (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন, তখনই তিনি এই দু'আটি পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمُوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرِجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবেশ প্রার্থনা করি।"

অর্থাৎ– আমার প্রবেশ যেন কল্যাণে ভরপুর হয়। আবার যখন ঘর থেকে আমি বের হই, তখন যেন তাও হয় কল্যাণে ভরপুর।

স্বভাবতই যখন কোনো মানুষ বাইরে গমন করে, তখন ঘরের কোনো খোঁজ-খবর আর তার কাছে থাকে না। ফিরে এসে না জানি কোনো বিপদের মোকাবেলা তাকে করতে হয়। দ্বীনি বা দুনিয়াবী নানা দুঃখ-দুর্দশা ও পেরেশানীর মধ্যে জড়িয়ে পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই ঘরে প্রবেশের পূর্বে আল্লাহর কাছে কল্যাণ চেয়ে নেয়া উচিৎ, যাতে সকলকে সুখী পাওয়া যায়।

আবার যখন ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন হবে, তখনও যেন কোনোরূপ প্রতিকূলতার মুখে পড়তে না হয় কিংবা যেন কোনো দুঃখ-কষ্ট বা পেরেশানীর তাগিদে বের হতে না হয়; বরং এই বের হওয়াও যেন সুখকর হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি ঘরে ফিরেই জানতে পারল, তার স্ত্রী অসুস্থ। এমতাবস্থায় তাকে ওষুধ ও চিকিৎসার জন্য ঘর থেকে বের হতে হলো অথবা ঘরের মধ্যে কোনো পেরেশানী দেখা দিল, আর এর তদ্বিরের জন্য তাকে ঘর থেকে বের হতে হলো। এ সবের কারণে বের হওয়া কিছুতেই সুখকর নয়।

এসব দুরাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই নবীজি (সাঃ) উক্ত দু'আটি শিক্ষা দান করেছেন। দু'আটি মুখস্ত রাখতে ঘরের দরজায় লিখে রাখা যায়। কেননা, দু'আটি তো যাবতীয় পেরেশানী থেকে রক্ষা পাওয়ার উপলক্ষ। পরকালের সওয়াব ও ফজিলত তো পৃথক পৃথকভাবেই লাভ হবে।

সুতরাং মানুষ যখন এই বলে দু'আ করে ঘরে প্রবেশ করবে যে, আমার ঘরে প্রবেশ করাও যেন কল্যাণকর হয় আর ঘর থেকে বের হওয়াও যেন কল্যাণকর হয়; তখন শয়তানের এই ঘরে প্রবেশ করার ও অবস্থান নেয়ার আর কোনো অবকাশ থাকে না। এ কারণেই শয়তান বলে, এই ঘরে আমার জন্য অবস্থান গ্রহণ করার আর কোনো সুযোগ নেই।

বড় বা কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আগে খাওয়া শুরু করবে

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন হুজুর (সাঃ)-এর সঙ্গে খাওয়ায় শরিক হতাম, তখন আমাদের নিয়ম এই ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নবীজি (সাঃ) আহার শুরু না করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা খাদ্যের দিকে হাত বাড়াতাম না, বরং আমরা সবাই অপেক্ষায় থাকতাম। অতঃপর যখন তিনি খানা শুরু করতেন, তখন আমরাও শুরু করতাম।

এই হাদীসটি থেকে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ এই মাসআলাটি চয়ন করেছেন যে, ছোটরা যখন বড়দের সাথে খেতে বসবে, তখন আদবের দাবি হলো, প্রথমেই ছোটরা শুরু করবে না, বরং বড়দের শুরু করার অপেক্ষা করবে।

শয়তানের ভোজনলিপ্সা প্রতিহত হওয়ার ঘটনা

হযরত হুযায়জা (রাঃ) বলেন, একবার খাওয়ার সময় আমরা নবীজি (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক কিশোরী দৌড়ে এসে দরবারে উপস্থিত হলো। মনে হচ্ছিল, শিশুটি ক্ষুধায় অস্থির। তখনও কেউ খাওয়া শুরু করেনি। কেননা, যেহেতু নবীজি (সাঃ) এখনো খাওয়া শুরু করেননি। মেয়েটি এসেই খাবারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, আর অমনি নবীজি (সাঃ) তার হাতটি ধরে ফেললেন ও তাকে খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখলেন।

অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের এক লোক এসে উপস্থিত হলো। মনে হচ্ছিল, এই লোকটিও চরম ক্ষুধার্ত। খাবারের দিকে সেও হাত বাড়াচ্ছিল। কিন্তু নবীজি (সাঃ) তাকেও খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখলেন।

এরপর তিনি সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "খাওয়ার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ না বললে শয়তান নিজের জন্য তা হালাল করে নিতে চেষ্টা করে। ঐ মেয়েটির মাধ্যমে প্রথমে শয়তান এ চেষ্টা করে। কিন্তু আমি

তা প্রতিহত করেছি। অতঃপর সে ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিটির মাধ্যমে চেষ্টা চালায়, সেটিও আমি প্রতিহত করেছি। আল্লাহর কসম, এই মেয়েটির হাতের সাথে এই মুহূর্তে শয়তানের হাতটিও আমার মুঠে ধৃত রয়েছে।" (মুসলিম)।

শিশুদের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত

এই হাদীস শরীফে হুজুর (সাঃ) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, বড়দের কর্তব্য হলো, যদি ছোটরা তার সম্মুখে আল্লাহর নাম না নিয়ে খানা শুরু করে দেয়, তাহলে প্রথমে সতর্ক করে দেবে; অতঃপর প্রয়োজন হলে হাত ধরে ফেলবে এবং বলবে, আগে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলো, তারপর খাও।

আমরাও তো আজ আমাদের পরিবার-পরিজনসহ খানা খেতে বসি; কিন্তু আমাদের ছেলে-মেয়েরা ইসলামী আদব পালন করছে কি-না, সেদিকে কেউই খেয়াল করছি না। এ কারণেই নবীজি (সাঃ) এই হাদীসটিতে বড়দের (হাতে-কলমে) শিক্ষা দিলেন, যাতে তারা ছোটদের প্রতি নজর রাখে। তাদের যেন কদমে কদমে ধরে ধরে ইসলামী আদব শেখাতে থাকে; নতুবা বরকত থেকে সকলেই বঞ্চিত হয়ে যাবে।

পরিশেষে শয়তান বমি করতে বাধ্য হলো

হযরত উমাইয়া বিন মুহাশ্যি (রাঃ) বলেন, একদা নবীজি (সাঃ) আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি নবীজির সম্মুখেই আহার করছিল। সে 'বিস্‌মিল্লাহ' না বলেই আহার শুরু করে দিল এবং সবগুলো খাবার শেষ করে ফেলল। শুধু শেষ লোকমাটি তখন বাকি ছিল। এই শেষ লোকমাটি যখন সে মুখে পুরছিল, তখন হঠাৎ তার মনে পড়ল যে, শুরুতে সে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলেনি; আর নবীজির (সাঃ) শিক্ষা হলো, এমতবস্থায় 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ' পড়তে হবে। লোকটি তা-ই করল। আর অমনি নবীজি (সাঃ) হাসতে লাগলেন। কারণ, শয়তান তখন লোকটির সঙ্গে খাচ্ছিল; কিন্তু যখনই সে উক্ত দু'আটি পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে শয়তান বমি করে সবকিছু বের করে দিল; অর্থাৎ এই ভোজনে তার যে অংশ ছিল, তা এই ছোট্ট দু'আর শক্তিতে খতম হয়ে যায়। নবীজি (সাঃ) ঘটনাটি সচক্ষে অবলোকন করে মুচকি হাসলেন। তিনি ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন যে, উম্মত যখন খাওয়ার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলতে ভুলে যাবে, অতঃপর স্মরণ হওয়া মাত্র 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ' পড়ে

নেবে, তখন এর উসিলায় খাবারের সকল বে-বরকতি দূর হয়ে যাবে। (আবু দাউদ)।

আমাদের সকল খাবারই আল্লাহর দান

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে সহজেই বোঝা হচ্ছে যে, আহারের পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা উচিত। 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে আহার আরম্ভ করার বিষয়টি তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু যদি একটু চিন্তা করা হয়, তাহলে বোঝা যায় যে, একদিকে তো এত বড় এক আমল, যার উসিলায় আহার করাও এবাদত ও সওয়াব লাভের উপায় হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে এই দু'আটি পড়ে নেয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মারিফাতের কত বড় দরজা খুলে যাচ্ছে।

কেননা, দু'আটি পড়ার প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষের বিবেককে এই বিষয়ে সজাগ করা যে, সম্মুখস্থ খাবার কোনো মানুষের শক্তি ও সামর্থের কৃতিত্ব নয়; বরং অপর কোনো দাতার দান। এই খাবার প্রস্তুত করার কোনো শক্তি মানুষের নেই। নিজের প্রয়োজন মিটানো, ক্ষুধা দূর করা কারোরই ক্ষমতাভুক্ত নয়। এ শুধু মহান আল্লাহরই দান। তাঁরই বদান্যতা যে, তিনি এই খাবারের ব্যবস্থা করেছেন ও নিজ কুদরতে এর দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করেছেন।

কীভাবে এই খাবার পৌঁছাল

বস্তুত এই 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়া আমাদের এ বিষয়ের প্রতি সতর্ক করছে যে, আমাদের একটু ভেবে দেখা উচিত, যে লোকমা আমি মুখে রেখে এক সেকেণ্ডে তা গলাধঃকরণ করছি, তা আমার কাছে পৌঁছতে এই বিশ্ব চরাচরের কত শক্তি ও প্রযুক্তি ব্যয় হয়েছে। একটি মাত্র গম আমার কাছে কীভাবে পৌঁছেছে, একবারও কী তা ভেবে দেখা উচিত নয়?

কোথাকার কোন্ কৃষক কখন কীভাবে কতবার কতদিন পর্যন্ত চেষ্টা করেছে শুধু জমিনকে বীজ বপণ করার উপযোগী করতে এবং নরম ও সমতল করতে। অতঃপর তাতে বীজ বপণ করেছে এবং পানি সিঞ্চন করেছে। এছাড়া বাতাসের প্রভাব, সূর্যের কিরণ, বৃষ্টি বর্ষণ এ সবই তো আল্লাহর অবারিত দান। তারপর ছোট্ট চিকন ও অতি দুর্বল একটি নতুন কুঁড়ি উৎপন্ন হয়েছে। আর তা এতটাই অসহায় যে, যদি ছোট্ট একটি শিশু

হাত দিয়ে একটিবার মন্থন করে দিত, তাহলেই তা সঙ্গে সঙ্গে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেত। এতদসত্ত্বেও মাটি বিদীর্ণ করে এই দুর্বল কুঁড়িটিই ধীরে ধীরে চারায় রূপান্তরিত হয়েছে। অতঃপর তা একটি বৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং তাতে গুচ্ছ ও শিষ্য গজিয়েছে, যাতে শস্যদানা উৎপন্ন হয়েছে। এরপর বহুলোক মিলে দানা ছাড়াবার কাজ করেছে। পশুর পায়ে মাড়াই হয়েছে। ঘড়-কুটো থেকে দানা আলগা করা হয়েছে। বস্তা বোঝাই করে বাসে, ট্রাকে, জাহাজ ও বিমানে শহরের পর শহর পাড়ি দিয়ে আমাদের ঘরে পৌঁছেছে। এরপর আরো কত লোক এর বেঁচাকেনা সম্পন্ন করেছে। একেকটা গমের দানাকে পিষে আটা বানিয়েছে এবং আমরা কিনে ঘরে এনেছি ও খামির করে রুটি তৈরি করেছি। এত সবকিছুর পর যখন তা আমার সম্মুখে পরিবেশিত হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি এক মুহূর্তে তা গলাধঃকরণ করে নিয়েছি।

একটু চিন্তা করে দেখা উচিত যে, পৃথিবীর এতসব শক্তিকে একত্র করে এক লোকমা খাবার তৈরি করে আহার করা কি আমার সাধ্য ছিল? আচ্ছা বলুন দেখি, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা কি আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? সূর্যের কিরণ পৌঁছানো কী আমার কাজ ছিল? আর ঐ ক্ষীণ কুঁড়িটিকে জমিন ফাটিয়ে বের করা কি আমার দ্বারা কখনো সম্ভব হতো? কোরআনের ভাষায়–

"একটু ভেবে দেখো, যে বীজ তোমরা বপণ করো, তা থেকে বৃক্ষ কি তোমরাই উৎপন্ন করো, না আমি তার উৎপাদক?" (আল ওয়াকেয়া)।

তোমরা এই কাজে লাখো-কোটি টাকা ব্যয় করে এবং হাজার প্রকারের প্রযুক্তি ব্যবহার করেও সফল হতে পারতে না। মূলত এই সবকিছু এক আল্লাহর দান ও তাঁর অনুগ্রহ। যখন কেউ এরূপ ধ্যান ও খেয়ালের সঙ্গে আহার করবে, তখন তার আহার গ্রহণ করা এবাদতে গণ্য হবে।

মুসলমান ও অমুসলমানের আহারের পার্থক্য

আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাঃ আব্দুল হাই সাহেব (রহঃ) বলতেন, দ্বীন মূলত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের নাম। দৃষ্টিভঙ্গিকে সামান্য পরিবর্তন করে নিতে পারলেই আমাদের দুনিয়া দ্বীন হয়ে যাবে। যেমন, 'বিস্‌মিল্লাহ' না পড়ে ও আল্লাহর নেয়ামতের স্মরণ না করে যদি আমরা আহার সমাপ্ত করি; তাহলেই ব্যস, মুসলমান ও কাফেরের মাঝে আর কোনো ফারাক বিদ্যমান

থাকবে না। এভাবে খানা সেও খাচ্ছে, মুলসমানও খাচ্ছে। এতে ক্ষুধা দূর হয়ে যাবে ও আস্বাদনের আনন্দও লাভ হবে। শুধু এতটুক যে, এই আহার আমাদের দুনিয়া হবে, কিন্তু দ্বীনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। গরু, মহিষ, ভেড়া, বকরী ও অপরাপর পশুরাও খাচ্ছে, আমরাও খাচ্ছি। উভয়ের মাঝে ব্যবধান নেই।

অধিক ভোজন কোনো কৃতিত্ব নয়

ভারতের বিখ্যাত দ্বীনি মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাশেম নানুতুভী (রহঃ)-এর একটি শিক্ষানীয় ঘটনা আছে। সে যুগে হিন্দুদের আরিয়া সমাজ ইসলামের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রোপাগাণ্ডা করে বেড়াত। হযরত তাদের সঙ্গে প্রায়ই বিতর্ক সভা করতেন, যাতে গণমানুষের সম্মুখে প্রকৃত সত্য ফুটে ওঠে। একবার তিনি এক বিতর্ক সভায় উপস্থিত হলেন। সেখানে আরিয়া সমাজের জনৈক পণ্ডিতের সাথে বাহাস সাব্যস্ত ছিল। বাহাস শুরু হওয়ার পূর্বেই সামান্য আহারের ব্যবস্থাও ছিল। হযরত (রহঃ) খুব অল্প খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। আহার পর্ব শুরু হলে তিনি দু'চার লোকমা খেয়ে উঠে এলেন। বিপক্ষের আরিয়া সমাজের যে পণ্ডিত এসেছিলেন, তিনি ছিলেন ভোজন-পাগল, মারাত্মক ধরনের পেটুক ব্যক্তি; তিনি তো ইচ্ছামতো আহার করে নিলেন।

আহারপর্ব শেষ হলে মেজবান হযরত (রহঃ)-কে বললেন, "আপনি যে একেবারে অল্প আহার করলেন?" হযরত (রহঃ) বললেন, "যতটুকু খাওয়ার ইচ্ছা ছিল, ততটুকু তো খেয়ে নিয়েছি।" ঐ হিন্দু পণ্ডিত কাছেই বসা ছিলেন। তিনি হযরত (রহঃ)-এর জবাব শুনে বললেন, "মাওলানা! আপনি তো আহারপর্বেই আমার কাছে পরাজিত হয়ে আছেন, এতো আপনার জন্য অশুভ লক্ষণ। আহারপর্বে যখন পরাজিত, তখন প্রমাণাদি ও যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রেও আপনি অবশ্যই পরাজিত হবেন।"

হযরত (রহঃ) এবার মুখ খুললেন। বললেন, "ভাই! যদি খানাপিনা নিয়ে তর্ক-বাহাস ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে কেন, কোনো মহিষ কিংবা বলদই তো এর জন্য যথেষ্ট ছিল। আপনি যদি এদের সাথে মোকাবেলা করেন, নিশ্চিত যে, আপনি পরাজিত হবেন। আমি তো এসেছিলাম প্রমাণাদি ও যুক্তি-তর্কে মোকাবেলা করতে, খানা-পিনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তো আমি আসিনি।"

পশু ও মানুষে ফারাক

হযরত (রহঃ)-এর উত্তরের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদি বিবেককে ব্যবহার করে দেখা হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে, খানাপিনায় মানুষ ও পশুতে কোনো ফারাক নেই। পশুরাও খায়, মানুষও খায়। আর আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক প্রাণীকে রিজিক দেন; এমনকি কখনো কখনো মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট রিজিকই দিয়ে থাকেন। শুধু এতটুকু যে, মানুষ খায় ও আল্লাহকে স্মরণ করে, কখনও তাকে ভুলে যায় না (পশুর ক্ষেত্রে এমনটি চিন্তা করা যায় না)। ব্যস, এই হলো মানুষ ও পশুর মাঝে ব্যবধান।

সোলায়মান (আঃ)-এর খোদার সৃষ্টিকে দাওয়াত প্রদান

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত সোলায়মান (আঃ)কে সমগ্র জাহানের বাদশা নিযুক্ত করলেন, তখন তিনি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আকুতি জানালেন, "হে আল্লাহ! আপনিই আমাকে সারা জাহানের রাজা বানিয়েছেন। আমার ইচ্ছা হয়, আপনার সকল মাখলুককে দাওয়াত করে এক বছর পর্যন্ত আহার করাই। আল্লাহ তায়ালা বললেন, "এ কাজে তোমার ক্ষমতা নেই।" তিনি আবার আরজ করলেন, হে আল্লাহ! তাহলে এক মাসের জন্য আমার আবেদন মনজুর করুন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, "এ কাজ তোমার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।" পরিশেষে তিনি এক দিনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, "তোমার এতটুকু সামর্থ্যও নেই, তবে তোমার পীড়াপীড়ির কারণে আপাতত তোমাকে একদিনের অনুমতি প্রদান করলাম।"

অনুমতি লাভ করে হযরত সোলায়মান (আঃ) মানব-দানব সকলকে সরকারী খাদ্যদ্রব্য জমা করার হুকুম প্রদান করলেন। রান্নার কাজও শুরু হয়ে গেল। কয়েক মাস ধরে রান্নার কাজ চলল। অতঃপর সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় এক বিরাট দস্তরখানা বিছানো হলো। তার ওপর খাবার ছড়িয়ে পরিবেশন করা হলো। বাতাসকে নির্দেশ দিলেন খাবারের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে, যাতে তা নষ্ট না হয়ে যায়। এরপর তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে বললেন, "খাবার প্রস্তুত হয়ে গেছে। এখন আপনি আপনার কোনো মাখলুককে পাঠিয়ে দিন।" আল্লাহ তায়ালা বললেন, "আমি প্রথমে আমার সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্য থেকে একটি মাছ তোমার দাওয়াত খাওয়ার

জন্য পাঠাচ্ছি।"

সমুদ্র থেকে একটি মাছ তীরে উঠে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে বলল, "ওহে নবী সোলায়মান! মনে হচ্ছে আজ তোমার পক্ষ থেকে দাওয়াত।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ আসুন, আসন গ্রহণ করুন ও আহার করুন।"

মাছটি এসে দস্তরখানার এক প্রান্ত থেকে খেতে শুরু করে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সব খানা একাই খেয়ে শেষ করে ফেলল। অতঃপর মাছ বলল, "আনুন, আরো আনুন।"

সোলায়মান (আঃ) বললেন, "তুমি তো সব খাবার খেয়ে শেষ করে ফেলেছো।"

মাছ বলল, "মেজবানের পক্ষ থেকে কি মেহমানকে এরূপই জবাব দেয়া হয়? শুনুন, আমার সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সর্বদাই আমি পেট পুরে খাবার খেয়েছি; কিন্তু আজ শুধু আপনার দাওয়াতের কারণে আমাকে অভুক্ত থাকতে হলো। যে পরিমাণ খাবার আজ আপনি প্রস্তুত করেছেন, সে পরিমাণ খাবার প্রতিদিন দু'বার করে আমার প্রতিপালক আমাকে দিয়ে থাকেন। কিন্তু আজ আমার পেট অপূর্ণই থেকে গেল।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে গেলেন ও ক্ষমা প্রার্থণা করতে থাকলেন। [নফহাতুল আরব]

আহার শেষে শোকর করা উচিত

যাই হোক, আল্লাহ তায়ালাই প্রত্যেক সৃষ্টির রিজিক পৌঁছান। সমুদ্র তলদেশে ও তার অন্ধকারে তিনিই রিজিক পৌঁছান। কোরআনের ভাষায়–

"পৃথিবীরে উপর বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজিক আল্লাহর জিম্মায় নেই।"

সুতরাং খানাপিনার পূর্বে মানুষ ও পশুর মাঝে কোনো ফারাক নেই। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত সেও পাচ্ছে (মানুষও পাচ্ছে)।

পশু-পাখির কথা না হয় ছেড়েই দিন, আল্লাহ তা'আলা তো তার ঐসব শত্রুকেও রিজিক দিয়ে থাকেন, যারা আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে থাকে, খোদার নামে মশকরা করে, খোদায়ে পাকের বদনাম করে বেড়ায়। যারা তাঁর দ্বীনের সাথে হাসি-মজাক করে, তিনি তাদেরও রিজিক দিয়ে থাকেন।

সুতরাং আহারের বিচারে মানুষ ও পশুর মাঝে তেমন কোনো ফারাক নেই। শুধু এতটুকু যে, পশু-পাখি ও কাফের-মুশরিক শুধু মুখের স্বাদ মেটায়, পেটের আগুন নেভায়; আর এই কারণে এরা খানাপিনার সময় আল্লাহর নাম নেয় না, আল্লাহর জিকির করে না।

আমরা মুসলমান; আমাদের একটু খেয়াল করে এসব খাদ্য-দ্রব্যকে আল্লাহ তায়ালার দান মনে করে ও তাঁর নাম উচ্চারণ করে খেতে হবে; অতঃপর শোকর করতে হবে। এই খাবারই তাহলে খোদার দ্বীন ও বন্দেগী বলে গণ্য হবে।

প্রতিটি কাজে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে নিতে হবে

জনাব ডাঃ সাহেব (রহঃ) বলতেন, আমি বছরের পর বছর আহারের পূর্বে অনুশীলন করেছি। যেমন, ঘরে প্রবেশ করলাম। খাওয়ার সময় হলো। দস্তরখানে বসে গেলাম, খাবারও সামনে দেয়া হলো। এখন ক্ষুধা প্রচণ্ড। খাবারও সুস্বাদু। মন চাচ্ছে, অবিলম্বে আহার আরম্ভ করি; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়ে মনে মনে বললাম, এই খাবার আমি খাব না। পরবর্তী মুহূর্তে চিন্তা করলাম, এই খাবার খোদার দান। আর আল্লাহ তা'আলা যা আমাকে দান করেছেন, তা আমার শক্তি ও সামর্থের কারিশমা নয়। নবীজি (সাঃ)-এর পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, যখন খাবার সামনে আসত, আল্লাহ তা'আলার শোকর করে তা খেয়ে নিতেন। তাই আমিও এই কারণে অর্থাৎ নবীজি (সাঃ)-এর অনুসরণে এই খাবারটা খাব। এরপর বিস্‌মিল্লাহ বলে খানা আরম্ভ করতাম।

ঘরে ঢুকে আমার শিশুটিকে খেলতে দেখে আনন্দিত হলাম। ইচ্ছে হলো, ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করি; কিন্তু একটু থেমে গিয়ে পরবর্তী মুহূর্তে চিন্তা করলাম, শুধু মনের চাহিদার কারণে ওকে সোহাগ করব না। ভাবলাম, হাদীস শরীফে আছে, নবীজি (সাঃ) শিশুদের আদর করতেন, ওদেরকে কোলে তুলে নিতেন। এখন আমিও তাঁর অনুসরণে আমার এই শিশুটিকে কোলে তুলে নেব ও আদর করব। হযরত বলতেন, এই অনুশীলন আমি বছরের পর বছর ধরে করেছি।

এরপর একটি কবিতার অংশবিশেষ পড়ে শোনাতেন, যার অর্থ-

"যুগ যুগ ধরে ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে কলিজা পানি করে ফেলেছি; চির অভ্যাস বদলানো কি অত সহজ।"

বছরের পর বছর অনুশীলনের দ্বারা আমার ঐ অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এখন আলহামদুলিল্লাহ, লৌকিক নয় বরং বাস্তব; যখনই এরূপ কোনো নেয়ামত সামনে আসে, তখনই প্রথমে মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয় যে, এগুলো খোদার দান। অতঃপর তাঁর শোকর আদায় করে কাজ সম্পন্ন করে ফেলি। এখন তো অভ্যাসই গড়ে উঠেছে। আর এই অভ্যাস গড়াকেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন বলা হয়। এর ফলেই দুনিয়াবী বিষয়াদিও দ্বীন হয়ে যায়।

খাবার একটি নেয়ামত

একদা জনাব ডাঃ সাহেবের সঙ্গে আমি এক দাওয়াতে গিয়েছিলাম। যখন দস্তরে খাবার এলো ও খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে গেল; তিনি বললেন, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো তো, এই যে খাবার যা তোমরা এখন খাচ্ছ, এতে খোদার বিভিন্ন প্রকারের কত শত নেয়ামত শামিল আছে! সর্বপ্রথম চিন্তা করে দেখো, শুধু খাবারই খোদার একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। কেননা, মানুষ যখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত থাকে, ক্ষুধার তাড়নায় তার জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে; খাওয়ার মতো কোনো কিছুই তার কাছে যখন না থাকে, তখন যত নিকৃষ্ট খাবারই তার সম্মুখে উপস্থিত করা হোক না কেন, সে তা গনীমত মনে করে খেতে প্রস্তুত হয়ে যায়; তাকে খোদার এক স্বতন্ত্র নেয়ামত মনে করে।

এতেই বোঝা যায় যে, খাবার ভালো হোক কিংবা মন্দ, সুস্বাদু কিংবা বিস্বাদ, যেমনই হোক না কেন, সব ধরনের খাবার নিজেই সরাসরি খোদার একটি নেয়ামত। এর কারণও সহজেই বোঝা যায় যে, এই খাবার দ্বারাই সে তার ক্ষুধা নিবারণ করে তাকে।

খাবারের স্বাদ আলাদা একটি নেয়ামত

খাবারের অপর একটি নেয়ামত হচ্ছে, তা সুস্বাদু এবং নিজের পছন্দসই হওয়া। কেননা, যদি খাবার বিদ্যমান থাকে; কিন্তু তা বিস্বাদ কিংবা নিজের পছন্দমত না হয়, তাহলে যদিও তা খেয়ে কোনো রকমে উদর পূর্ণ করে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করা হবে; কিন্তু তাতে মনের তৃপ্তি মিটবে না। সুতরাং সুস্পষ্ট যে, এই স্বাদ বা পছন্দসই হওয়াও খাবারের একটি নেয়ামত।

সম্মানের সাথে খাবার লাভ করা তৃতীয় নেয়ামত

খাবারের তৃতীয় নেয়ামত হলো, সম্মান ও মর্যাদার সাথে তা লাভ করা। কেননা, অনেক সময় ভালো-মজাদার খাবার তো পাওয়া যায়; কিন্তু দাতা গ্রহীতাকে অপমান করে ছাড়ে। যেমন, কখনও চাকরকে এমনভাবে খাবার প্রদান করা হয় যে, তাতে তাকে অপদস্ত হতে হয়। ফলে খাবারের যাবতীয় স্বাদ মুহূর্তে বিস্বাদে পরিণত হয়ে যায়। জনৈক কবি বিষয়টি যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তার অর্থ হলো-

"এমন রিজিকের চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়, যার ফলে অপদস্ত হতে হয় এবং জীবনাচার পিছিয়ে যায়।"

সুতরাং কেউ যদি অপমানের সাথে খাবার খাওয়ায়, তাতেও কোনো আনন্দ থাকে না; সেই খাবারও হয়ে পড়ে অর্থহীন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, এই তৃতীয় নেয়ামতটিও আমাদের অর্জিত আছে। অর্থাৎ অন্নদানকারী আমাদের এখন পর্যন্তও বড় ইজ্জতের সাথেই অন্নদান করছেন।

ক্ষুধা পাওয়া চতুর্থ নেয়ামত

চতুর্থ নেয়ামত হচ্ছে ক্ষুধা পাওয়া, খাওয়ার আগ্রহ হওয়া। কেননা, উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও সম্মানজনক খাবার যদিও কখনো হস্তগত হয়; কিন্তু খাওয়ার আগ্রহ না হয়, ক্ষুধা না পায় কিংবা পেট খারাপ থাকে, তখন উন্নত থেকে উন্নত খাবারও নিরর্থক হয়ে পড়ে। কেননা, মানুষ তা গ্রহণ করতে পারে না। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, সুস্বাদু, সম্মানজনক খাবার, তদুপরি ক্ষুধা ও ইচ্ছা হওয়া- সবই বিদ্যমান রয়েছে।

খাওয়ার সময় নির্ঝঞ্ঝাট থাকা পঞ্চম নেয়ামত

পঞ্চম নেয়ামত হলো, খাওয়ার সময় সুস্থ ও শান্ত থাকতে পারা; কোনো পেরেশানি ও অস্থিরতা না থাকা। কেননা সুস্বাদু ও সম্মানজনক খাবারের ব্যবস্থা এবং খাওয়ার ইচ্ছা ও ক্ষুধা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় এমন কোনো দুঃসংবাদ কিংবা দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হয়ে যেতে পারে, যার দরুন মন-মগজ অস্থির ও পেরেশান হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায়ও ঐসব খাবার বেকার ও বিস্বাদে পরিণত হয়ে যায়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আমাদের সুস্থতা ও পেরেশানীহীনতা সবই বিদ্যমান আছে। আমাদের এমন কোনো অবস্থা নেই, যার দরুন সুস্বাদু খাবার বিস্বাদে পরিণত হয়ে যায়।

সঙ্গী-সাথী ও প্রিয়জনদের সাথে খেতে পারা ষষ্ঠ নেয়ামত

ষষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে, সঙ্গী-সাথী ও প্রিয়জন-আপনজনদের সাথে মিলেমিশে একত্রে খাওয়ার সুযোগ লাভ করা। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও একাকি খেতে বাধ্য হওয়াও কম বড় বিপদ নয়। কেননা, একাকি খাওয়া ও বন্ধুদের সাথে একত্রে খাওয়ার মাঝে বিরাট ফারাক রয়েছে। বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে খাওয়ার মধ্যে যে স্বাদ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, তা একাকি খাওয়ার মাঝে পাওয়া যায় না। সুতরাং এটিও একটি পৃথক নেয়ামত।

তিনি (ডাঃ সাহেব) তাই বলতেন, এই খাবার নিজে এক নেয়ামত; আর এর মাঝে লুকায়িত আছে আরো অনেক নেয়ামত। এরপরও কি আমাদের শোকর করা উচিত নয়?

খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন এবাদতের সমষ্টি

সুতরাং যখন এসব খাবার এই অনুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করা হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই এসব নেয়ামত দান করেছেন, তখন প্রতিটি নেয়ামতের ক্ষেত্রেই খোদার শোকর আদায় করে তা গ্রহণ করা কর্তব্য হয়ে পড়বে এবং যখন এভাবে প্রতিটি নেয়ামতের ক্ষেত্রেই শোকর আদায় করতে করতে আহার করা হবে, তখন একদিকে তা খাবারের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এবাদতের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। কেননা, যদি শুধু 'বিসমিল্লাহ' পড়েই আহার করা হত, অন্য কোনো নেয়ামতের কথা স্মরণ না করা হতো, তবুও ঐ খাবার এবাদত হয়ে যেত। কিন্তু যখন একাধিক নেয়ামতের কথা স্মরণ করে ও সেগুলোর উপর শোকর আদায় করতে করতে আহার করা হলো, তখন তো এই একটি মাত্র খাবারই অনেকগুলো এবাদতের সমষ্টি হয়ে গেল। আর এভাবেই এই খানাপিনা যা প্রকৃত অর্থে একটি নিরেট দুনিয়া ছিল, তা দ্বারা একদিকে যেমন তৃপ্তি ও তুষ্টি লাভ হচ্ছে, অপরদিকে আমাদের সৎকর্মসমূহের মধ্যে পরিবর্ধনের উপলক্ষ হচ্ছে। আর এরই নাম 'দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন', এর দ্বারাই মানুষের দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যায়।

মাওলানা শেখ শাদী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই আকাশ, এই জমিন, এই মেঘমালা, এই চাঁদ, এই সূর্য- সবকিছুই তোমাদের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের আহারের কিছু ব্যবস্থা হয়ে যায়; সুতরাং তোমরা তা আলস্যের সাথে আহার কর। তোমাদের দায়িত্ব তো এতটুকুই যে আল্লাহ্র নাম নিয়ে, তাকে স্মরণ করে আহার করো। আর

আহারের শুরুতে যদি কখনও আল্লাহ্‌র নাম নিতে ভুলে যাও, তখন মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ' বলে নিও।

নফল আমলের ক্ষতিপূরণ

আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাঃ আব্দুল হাই সাহেব (রহঃ) উক্ত হাদীসের আলোকে বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার কোনো নফল এবাদত সময়মতো আদায় করার কথা ভুলে যায় অথবা কোনো ওজরের কারণে তা আদায় করতে না পারে, তাহলে যেন সে মনে না করে যে, এখন তো নফল পড়ার সময় শেষ হয়ে গেছে, আর আদায় করতে হবে না। বরং পরে যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে, তখনই ঐ নফল এবাদত আদায় করে নেবে।

একবার আমরা তার সঙ্গে এক মাহ্‌ফিলে শরীক হওয়ার জন্য যাচ্ছিলাম। মাগরিবের পূর্বেই সেখানে পৌঁছার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের রওনা করতেই দেরি হয়েছিল। যার ফলে মাগরিবের নামাজ পথেই এক মসজিদে আদায় করি। যেহেতু ধারণা হচ্ছিল যে, লোকজন ওখানে অপেক্ষা করতে থাকবে, এ কারণেই হযরত শুধু তিন রাকাত ফরজ ও দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করলেন।

আমরাও তাই করলাম। অতঃপর দ্রুত রওনা হলাম, যাতে যারা আমাদের অপেক্ষায় আছেন, তাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। মাহ্‌ফিল শুরু হলো। ঈশার নামাজও আমরা এখানেই পড়ে নিলাম। রাত দশটা পর্যন্ত মাহ্‌ফিল চলল।

সবশেষে ওখান থেকে প্রস্থানের পূর্বে হযরত আমাদের ডেকে বললেন, আজকের মাগরিবের পরের আওয়াবীন কোথায় গেল? আমরা উত্তর দিলাম, তা তো আজ রয়েই গেছে। পথে তাড়াহুড়া ছিল, তাই পড়ার সুযোগ হয়নি।

হযরত বললেন, রয়ে গেল- কোনোরূপ বদল-বিনিময় ব্যতীতই রয়ে গেল? আমরা বললাম, হযরত! যেহেতু লোকজন অপেক্ষায় ছিল, তাড়াতাড়ি পৌঁছার দরকার ছিল। এ কারণেই আওয়াবীনের নামাজ রয়ে গেল।

হযরত বললেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ। আমি যখন এশার নামায আদায় করলাম, তারপর যেসব নফল আমি সাধারণত পড়ে থাকি, তার সাথে অতিরিক্ত ছয় রাকাত নফলও আজ আদায় করে নিয়েছি। এখন যদিও তা

আওয়াবীন নয়, কেননা, আওয়াবীনের ওয়াক্ত তখন ছিল না, তবুও মনে করলাম, আজকের ছুটে যাওয়া আওয়াবীনের কোনো না কোনো স্তরের ক্ষতিপূরণ তো হওয়া দরকার।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো এখন ছয় রাকাত পড়ে আওয়াবীনের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেছি; এখন তোমাদের ব্যাপার তোমরা জানো।

অতঃপর বললেন, তোমরা মৌলভী মানুষ। তাই এখনই বলবে, নফলের কাজা হয় না। কেননা, কাজা শুধু ফরজ ও ওয়াজিবের হয়ে থাকে; সুন্নত ও নফলের কাজা হয় না। আপনি কিভাবে আওয়াবীনের কাজা আদায় করলেন?

আচ্ছা ভাই! তোমরা কি ঐ হাদীসটি পড়েছ, যাতে নবীজি (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যদি তোমরা খাওয়ার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা ভুলে যাও, তাহলে খাওয়ার মাঝে যখনই স্মরণ হবে তখনই পড়ে নেবে। যদি শেষে স্মরণ হয়, তাহলেও তখনই পড়ে নেবে।

আচ্ছা, এই দু'আ পড়া কি কোনো ফরজ ছিল? নিশ্চয়ই না। তাহলে কেন তিনি বললেন, পড়ে নিও।

কথা মূলত এই যে, কোনো নফল বা মুস্তাহাব- যা নিঃসন্দেহে নেক কাজ এবং যা দ্বারা আমলনামা বৃদ্ধি পেতে পারত- তা যদি কোনো কারণে ছুটেও গিয়ে থাকে, তবুও একেবারে ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়; বরং অন্য সময় তা পড়ে নেয়া উচিত। সেক্ষেত্রে যদিও কাজা বলা, না বলার অবকাশ নেই, তবুও কমপক্ষে কিছুটা ক্ষতিপূরণ তো হয়ে গেল।

এই হচ্ছে বড়দের কাছ থেকে শেখার বিষয়। সত্যিকার অর্থে, সেদিন হযরত আমাদের সম্মুখে এক বিরাট দরজা খুলে দিয়েছেন।

আমরা এমনটিই মনে করতাম। আর ফেকাহর কিতাবাদিতেও লেখা আছে, নফলের কাজা নেই।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যে, নফলের কাজা তো আসলেই নেই। কিন্তু তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ তো হতে পারে। কারণ, এই নফল বাদ যাওয়ার কারণে ক্ষতি তো হলই, নেকিও কমলো। কিন্তু পরে যখন সময় হবে, তখন তো তা পড়া যেতে পারে। একদিক থেকে কমে গেলেও অপরদিক থেকে বেড়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা হযরতকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন!

দস্তরখানা ওঠাবার সময়ের দুআ

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, দস্তরখান ওঠাবার সময় নবীজি (সাঃ) এই দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُكَفِّى وَلَا مُوَدَّعٍ اِلَّا مُسْتَغْنى عَنْهُ رَبَّنَا ۔

অর্থ ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার; অধিক, উত্তম ও বর্ধিত হোক তাঁর এই প্রশংসা। হে আমাদের প্রতিপালক! এই দপ্তর আবারো আমাদের চাই; আমরা একে সর্বোতভাবে বিদায় করে দিচ্ছি না; আমরা এ থেকে বে-নিয়াযও নই।"

এই অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক দুআটি হুজুর (সাঃ) শিক্ষাদান করেছেন। এর কারণ হল, মানুষের মেজাজ অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক। আর তা হচ্ছে, মানুষের যখন কোনো কিছুর তীব্র প্রয়োজন হয়, তখন সে তার জন্য সীমাহীন অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু যখনই তার সে প্রয়োজন মিটে যায় এবং মন ভরে যায়, তখন সে তার প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে থাকে।

যেমন, যখন মানুষের ক্ষুধা পায়, তখন সে খাবারের প্রতি আকৃষ্ট ও দুর্বল থাকে; কিন্তু যখন পেট ভরে যায় ও ক্ষুধা মিটে যায়, তখন তার খাবারের প্রতি অনিচ্ছা ও অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়; কখনও আবার ঐ খাবারের কল্পনার দ্বারাই তার বমি আসতে থাকে। এ কারণেই হুজুর (সাঃ) উক্ত দু'আর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিলেন যে, তোমাদের মনের এই অনাগ্রহ ও অনিচ্ছার কারণে যেন আল্লাহর রিজিকের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি না হয়।

তাইতো তিনি এভাবে দু'আ করলেন যে, "হে আল্লাহ! এই মুহূর্তে তো দস্তরখানা ওঠাচ্ছি, কিন্ত তা এ কারণে নয় যে, আমাদের কাছে এর কোনো কদর নেই; বরং ঐ খাবারের মাধ্যমেই তো আমাদের ক্ষুধাও নিবারণ হলো আর আমরা তাতে পরিতুষ্টও হলাম; আর এ কারণেও নয় যে, আমাদের আর তার প্রয়োজন নেই। হে আল্লাহ! আমরা এ থেকে বে-নিয়াজ হতে পারি না। কারণ, একটু পরই আবার আমাদের তা প্রয়োজন পড়বে।"

দস্তরখানা ওঠাবার সময় উক্ত দু'আটি পড়ে নেয়ার অভ্যাস করি, যাতে আল্লাহ তায়ালার রিজিকের প্রতি না-কদরী হয় এবং যাতে এই দু'আও হয়ে যায় যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আবার রিজিক দিও।

খাওয়ার পর দু'আ পড়া দ্বারা গোনাহ মোচন হয়

হযরত মুআজ বিন আনাস (রাঃ) বলেন, হুজুর (স) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি খাওয়ার পর নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে, তার পেছনের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" (তিরমিযী)

দু'আটি হলো–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنْ لَا قُوَّةَ

অর্থ ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার, যিনি আমাকে এই খাবার খাওয়ালেন এবং যিনি তা আমাকে আমার কোনরূপ শক্তি ও সামর্থ ব্যতিরেকেই দান করলেন।"

এখন চিন্তার বিষয় হলো, ছোট্ট একটি আমল অথচ তার বদলা ও বিনিময় এই যে, পাঠকের অতীতের কৃত সকল গোনাহ ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যায় এর মাধ্যমে। এটি আল্লাহ তা'আলার কত বড় অনুগ্রহ।

আমল সামান্য, বিনিময় বিশাল

পূর্বেও আমি একাধিকবার আরজ করে এসেছি যে, হাদীস শরীফের যেখানেই বর্ণিত হয়েছে, অমুক আমলের দ্বারা গোনাহ মাফ হয়ে যায়, এতে ছগীরা গোনাহকেই বোঝানো হয়েছে। কবীরা গোনাহের ব্যাপারে বিধান হলো, তা তওবা ব্যতিরেকে মাফ হয় না। অনুরূপভাবে, বন্দার হকও তার ক্ষমা ব্যতীত ক্ষমা হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ছগীরা গোনাহসমূহ নেক আমলের দ্বারা মাফ করে দেন।

সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি খানা খাওয়ার পর উপরোক্ত দু'আটি পড়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার সকল ছগীরাহ গোনাহ মাফ করে দেবেন। এতে লোকটি যাবতীয় ছগীরা গোনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এটি এমনিতে ছোট একটি আমল, কিন্তু তার বদলা ও বিনিময় অতি বিশাল।

হযরত ডাঃ সাহেব (রহঃ) প্রায়ই বলতেন, হুজুর (সাঃ) আমাদের

নুসখায়ে কিমিয়া বা 'অল্পে অনেক' এই সূত্রটি শিখিয়ে গেছেন। এখন মানুষ তা জোড়ে পড়ুক কিংবা আস্তে কিংবা মনে মনে, শোকর আদায় হয়ে যাবে। আর মানুষ ঐ বিনিময়েরও হকদার সাব্যস্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের সবাইকে এইসব আদবের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

খাদ্যের দোষ না ধরি

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) কখনও কোনো খাবারের দোষ ধরেননি। আর কখনো কোনো খাবারকে খারাপ বলেননি। তাঁর যদি ইচ্ছা হতো, তাহলে তিনি খেয়ে নিতেন, ইচ্ছা না হলে রেখে দিতেন। (বুখারী)

অর্থাৎ- খাবার যদি তাঁর পছন্দসই না হতো, তাহলে তিনি তা খেতেন না; কিন্তু কখনও তার দোষ বর্ণনা করতেন না। কারণ হলো, খাবারটা যেমনই হোক না কেন, আমার তা পছন্দ হোক বা না হোক, এ-তো আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক। আর আল্লাহ তা'আলার দান করা রিজিকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের উপর ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট কোনো কিছুই নিরর্থক নয়

স্বাভাবিকভাবেই এই বিশ্ব চরাচরের কোনো বস্তুই এমন নয়, যাকে আল্লাহ তা'আলা কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যতীতই সৃষ্টি করে রেখেছেন। এই বিশ্ব জাহানের প্রতিটি বস্তুই কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে। প্রতিটি বস্তুতেই কোনো না কোনো কাজ ও উপকারিতা অবশ্যই আছে। মরহুম ইকবাল বড় সুন্দর করে বলেছেন–

"আল্লাহ তা'আলার এই বিশ্বে কোনো বস্তুই নিকৃষ্ট নয়।"

সৃষ্টিগতভাবে সব বস্তুই ভালো, সব কিছুরই মাঝে সৃষ্টি হিসেবে কোনো না কোনো উপকারিতা অবশ্যই আছে। হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বস্তুর উপকারিতা সম্পর্কে অবগত হতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে মন্দ বলতে থাকি। নতুবা প্রকৃত সত্য এই যে, কোনো কিছুই মন্দ নয়। এমনকি কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর জীবজন্তু, যথা– সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি কিছুটা ক্ষতি করে ফেলে। কিন্তু সৃষ্টি জগতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার বিচারে ঐগুলোতেও কোনো না কোনো উপকারিতা অবশ্যই আছে- আমরা তা জানি বা না-জানি।

বাদশাহ ও মাছি

জনৈক বাদশাহর ঘটনা রয়েছে যে, একবার তিনি দরবারে বড় শান-শওকতের সাথে বসা ছিলেন। হঠাৎ একটা মাছি এসে তার নাকের ডগায় বসে পড়ল। বাদশাহ মাছিটাকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু সে ফিরে এসে আবার বসে পড়ল। বাদশাহও দ্বিতীয়বার তাকে উড়িয়ে দিল।

আপনারা দেখে থাকবেন, অনেক মাছি খুবই ছেচড়া প্রকৃতির হয়ে থাকে। যতবারই তাকে তাড়াবেন, ফিরে এসে আবার সে জায়গামতো বসে পড়বে।

তো সে মাছিটিও ঐ রকমের ছিল। বাদশাহ তাই বললেন, আল্লাহ-ই জানেন, এই মাছিকে তিনি কেন পয়দা করেছেন। এ তো শুধু কষ্টই দিয়ে যাচ্ছে, এর তো কোনো উপকারিতা দেখতে পাচ্ছি না। তখন দরবারে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি বসা ছিলেন। তিনি বললেন, এই মাছির একটা উপকার তো এই যে, আপনার মতো অহংকারী বাদশাহর দেমাগ ধোলাই করার জন্য তা ব্যবহার হচ্ছে। আপনি আপনার নাকে মাছিটাকে বসতে দিচ্ছেন না; আর আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দিচ্ছেন, আপনি এত বড় অক্ষম ব্যক্তি যে, সামান্য একটা মাছিরও মোকাবেলা করার শক্তি আপনার নেই। এই মাছিটির সৃষ্টিতে এই একটি মাত্র হিকমতই বা কম কিসের? যাই হোক, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বস্তু কোনো না কোনো উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

একটি বিচ্ছুর এক আশ্চার্যজনক ঘটনা

ইমাম রাজী (রহঃ) সুপ্রসিদ্ধ বুজুর্গ এবং এলমে কালামের একজন সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। যিনি তাফসীরে কবির নামে কোরআন পাকের সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ তাফসীর লিখেছেন। ঐ তাফসীরের মধ্যে শুধু সূরা ফাতেহার তাফসীর করেছেন দু'শত পৃষ্ঠাব্যাপী। তাতে সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনা লিখেছেন।

তিনি বলেন, আমি জনৈক বাগদাদনিবাসী বুজুর্গের মুখে নিজের কানে তাঁর ঘটনা শুনেছি। বুজুর্গ বলেন, একদিন বিকেলে পায়চারী করার জন্য আমি দজলা নদীর তীরে চলে গেলাম। নদীর কিনারে কিনারে চলতে চলতে হঠাৎ আমি আমার সম্মুখে একটি বিচ্ছুকে চলতে দেখলাম। আমার মনে উদয় হলো, এই বিচ্ছুও তো আল্লাহ তা'আলারই

সৃষ্টি। আর সন্দেহ নেই যে, একেও তিনি কোনো না কোনো প্রয়োজনে ও উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন।

এই মুহূর্তে জানি না এটি কোথা থেকে বের হয়ে কোথায় যাবে, এর ঠিকানাই বা কোথায়, কী-ই বা করবে।

বুজর্গের মনে কৌতূহল জাগল। ভাবলেন, আজ আমার হাতে বেশ সময়ও আছে। আর আমি তো এখন ভ্রমণেই বের হয়েছি। সুতরাং দেখব এটি যায় কোথায়, কী করে। যাই হোক, বিচ্ছুটা আমার আগে আগে চলতে থাকল, আর আমি তার পিছে পিছে চলতে থাকলাম।

কিচুক্ষণের মধ্যেই সেটি সমুদ্রের কিনারে গিয়ে পৌঁছল। আমিও তার পেছনে পেছনে সেখানেই গিয়ে থামলাম। মুহূর্তেই দেখতে পেলাম একটি কচ্ছপ কিনারের দিকে আসছে; আর ঐ বিচ্ছুটা লাফ মেরে কচ্ছপের পিঠে চড়ে বসেছে। এভাবেই খোদা তার নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কচ্ছপ তাকে পিঠে বহন করে নিয়ে চলল। আমিও নৌকা ভাড়া করে কচ্ছপের পেছনে পেছনে চললাম। আমার একটাই সংকল্প, এই বিচ্ছুটার কাজ আজ আমি দেখবই। অল্প সময় পর কচ্ছপ নদীর অপর তীরে গিয়ে থামল। আর ঐ বিচ্ছুটা লাফ দিয়ে তীরে গিয়ে নামল। আমি বিচ্ছুর পেছনে পেছনে চললাম।

কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি একটি গাছের নীচে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। ভয় হলো, হয়তো এই বিচ্ছুটা এখনই ঐ লোকটিকে দংশন করবে। ভাবলাম, আগে গিয়ে আমি ঐ লোকটিকে তুলে দেব, যাতে তার জীবনটা আপাতত বেঁচে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, একটা বিষাক্ত সাপ ফণা তুলে লোকটির মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এখনই হয়তো দংশন করবে। এরই মধ্যে এ বিচ্ছুটা দ্রুত অগ্রসর হয়ে সাপটার মাথায় এমনভাবে দংশন করল যে, সঙ্গে সঙ্গে তা পালট খেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আর বিচ্ছুটা অন্যদিকে রওনা করল। মুহূর্তেই লোকটির চোখ খুলে গেল। সে দেখল, একটি বিচ্ছু তার নিকট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা পাথর তুলে সে ঐ বিচ্ছুটার গায়ে ছুঁড়ে মারার জন্য চেষ্টা করছে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে এই সব ঘটনা অবলোকন করছি।

আমি তাড়াতাড়ি লোকটির হাত ধরে ফেললাম। বললাম, এই বিচ্ছুটাই তো আজ তোমার জীবন রক্ষা করল। এটি তোমার উপর বিরাট অনুগ্রহ। আর তুমি ওরই সর্বনাশ করত যাচ্ছো। এই সাপটা তোমাকে দংশন করতে

উদ্যত হয়েছিল। এখনই তোমাকে মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু বহু দূর থেকে খোদা তোমার জন্য এই বিচ্ছুটাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বুজুর্গ বললেন, আজ আমি স্বচক্ষে খোদার লালন-পালনের কারিশমা অবলোকন করলাম। একটা জীবন বাঁচাতে তিনি কীভাবে নদীর ওপার থেকে এই বিচ্ছুটাকে বয়ে আনলেন। অতঃপর এইসব ঘটনা ঘটালেন ও লোকটির জীবন রক্ষা পেল।

বস্তুত দুনিয়ার কোনো বস্তুই এমন নেই, যার সৃষ্টিতে কোনো না কোনো রহস্য লুকায়িত নেই।

মল-মূত্রে সৃষ্টি হওয়া পোকা-মাকড়ের উপকারিতা

অপর এক ঘটনা আমি দেখেছি; জানিনা সঠিক কিনা। সঠিক হলে বিশেষ শিক্ষামূলক ঘটনা সেটি। ঘটনাটি এই–

একবার এক ব্যক্তি তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছিল। তখন নীচে পায়খানার মধ্যে এক ধরনের সাদা সাদা পোকার উপর তার দৃষ্টি পড়ল। এই ধরনের পোকা অনেকের পেটের মধ্যে হয়ে থাকে। তিনি ভাবলেন, অন্যান্য জীবজন্তুর সৃষ্টিতে কোনো না কোনো উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা তো বোধগম্য; কিন্তু এই প্রাণীটা, যার জন্মই নাপাকির মধ্যে, পায়খানার সাথেই তার উৎপত্তি, ওখানেই তাকে ভাসিয়ে ফেলে দেয়া হয়; এর মধ্যে কোনো উপকার আমার নজরে পড়ে না। আল্লাহই ভাল জানেন, কী উদ্দেশ্যে তিনি একে সৃষ্টি করেছেন।

কিছুদিন পর লোকটির চোখে অসুখ দেখা দিল। এর পিছনে তিনি সব চিকিৎসা সমাপ্ত করলেন। কিন্তু কোনো উপকার হল না। শেষে জনৈক প্রবীণ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা প্রার্থনা করলেন। ডাক্তার বললেন, আপাতত এর কোনো চিকিৎসা আমি দেখতে পাচ্ছি না; তবে একটা চিকিৎসার কথা মনে পড়ছে, যা কখনো কখনো কাজে লাগে। আর তা হচ্ছে, মানুষের পেটের ভেতরের যে পোকা জন্মায়, তা পিষে চোখে লাগালে অনেক সময় এই রোগ থেকে নিরাময় লাভ হয়। এতক্ষণে আমি বললাম, খোদা! আজ বুঝতে পারলাম, কেন আপনি এই পোকা পয়দা করেছেন।

মোটকথা, এই বিশ্ব চরাচরের কোনো সৃষ্টিই এমন নেই, যার কোনো না কোনো উপকার নেই।

একই কথা আমাদের সম্মুখস্থ খাবারের ব্যাপারেও। হয়ত তা আমাদের মনোপূত নয়; কিন্তু তার সৃষ্টিতে কোনো না কোনো উপকারিতা অবশ্যই আছে। অন্ততপক্ষে আল্লাহ তা'আলার রিজিক হিসেবে এর সম্মান করা জরুরী। সুতরাং কোনো খাবার যদি আমাদের অপছন্দ হয়, আমরা তা খাবো না। কিন্তু মন্দও বলব না।

অনেকের অভ্যাস, খাবার পছন্দ না হলে দোষ খুঁজতে ও বলতে শুরু করে দেয়, এতে অমুক খারাবী আছে কিংবা এটি বিস্বাদ, বেমজা। এরূপ বলা দুরস্ত নেই।

রিজিকের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন অনুচিত

এ-ও নবীজির (সাঃ)-এর এক বড় ও উন্নত শিক্ষা যে, খোদার রিজিকের সম্মান করো, তার প্রতি আদবের খেলাপ আচরণ করো না।

আমাদের এই সামজে আজ ইসলামের এই আদবটি ভয়ানক উপেক্ষার শিকর হচ্ছে। সব কিছুতে আজ আমরা অপরের অনুকরণ শুরু করে দিয়েছি। খাবারের ব্যাপারেও তাই হচ্ছে। এভাবে এতে আর কোনো আদব অবশিষ্ট থাকছে না।

অতিরিক্ত খাবার ডাষ্টবিনে ফেলে দিচ্ছি, কখনো দেখে আত্মা কেঁপে ওঠে। হায়, মুসলমানদের ঘরে আজ একি হচ্ছে! বিশেষত ভোজের অনুষ্ঠানসমূহে ও ভোজনালয়ে খাবারের স্তূপ ডাষ্টবিনে যাচ্ছে। অথচ আমাদের দ্বীনের শিক্ষা– যদি রুটির ছোট্ট টুকরাও কোথাও পড়ে থাকে, সেটিরও সম্মান করো। সেটিকে তুলে কোনো উঁচু স্থানে রেখে দাও।

হযরত থানভী (রহ) ও খাবারের সম্মান

আমি আমার পীর হযরত ডাঃ আবদুল হাই সাহেব (রহঃ)-এর কাছে এই ঘটনাটি শুনেছি।

একবার হযরত থানভী (রহঃ) অসুস্থ হলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে কিছু দুধ পান করতে দিল। তিনি দুধ পান করলেন। সামান্য একটু বেঁচে গেল। অবশিষ্ট দুধটুকু তিনি শিয়রের কাছে রেখে দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠে কাছের এক লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, বেঁচে যাওয়া ঐ দুধটুকু কোথায়? লোকটি বলল, তা তো ফেলে দেয়া হয়েছে। সামান্যই ছিল, মাত্র এক ঢোক।

হযরত থানভী (রহঃ) ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর এই নেয়ামতটুকু ফেলে দিয়ে বড়ই অন্যায় করেছো। আমি যখন পান করতে পারলাম না, তাহলে তোমরা তা পান করে নিতে কিংবা কাউকে পান করতে দিতে অথবা বিড়ালকে দিয়ে দিতে অথবা তোতাকে পান করাতে। আল্লাহর কোন সৃষ্টির তাতে উপকার হত। তোমরা তা ফেলে দিলে কেন?

এরপর তিনি এক মূলনীতি বলে দিলেন; যেসব বস্তুর এক বিশেষ পরিমাণ বা বড় পরিমাণ মানুষ তার স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যবহার করে বা খায় ও পান করে, সেসব বস্তুর স্বল্প ও সামান্য পরিমাণের সংরক্ষণ ওয়াজিব। যেমন– খাবারের একটি বিরাট পরিমাণ মানুষ ব্যবহার করে অর্থাৎ খায়। এ দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করে ও প্রয়োজন মেটায়। সুতরাং এর যদি সামান্য পরিমাণ বেঁচে যায়, তাহলে তার সম্মান ও সংরক্ষণ ওয়াজিব। তা নষ্ট করা জায়েজ নয়। এটি মূলত ঐ হাদীসের সার, যাতে বলা হয়েছে, আল্লাহর রিজিকের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করো না। একে কোনো না কোনো কল্যাণকর খাতে ব্যয় করো।

দস্তারখানা ঝাড়ার সঠিক নিয়ম

দেওবন্দ মাদ্রাসায় আমার আব্বাজান (রহঃ)-এর একজন ওস্তাদ ছিলেন। তার নাম হযরত মাওলানা আসগর হুসাইন (রহঃ)। 'মিয়া সাহেব' নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বড় অদ্ভুত রকমের বুজুর্গ ছিলেন। তার কথা ও ঘটনা শুনলে সাহাবায়ে কেরামগণের জামানার স্মরণ প্রকট হয়ে উঠত।

আব্বাজান বলেন, একবার আমি তার খেদমতে গেলাম। তিনি বললেন, এসো, খানা খেয়ে নাও। আমি তাঁর সাথে খেতে বসলাম। খাওয়া শেষ হলে আমি দস্তরখানা গুটাতে শুরু করে দিলাম, যাতে আমি দস্তরখানা ঝেড়ে দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। তখন তিনি আমার হাত ধরে বললেন, এ কী করছো? আমি জবাব দিলাম, হযরত, দস্তরখানা ঝাড়তে যাচ্ছি। তিনি বললেন, দস্তরখানা ঝাড়তে জানো? আমি বললাম, হযরত, এ কি কোনো কঠিন কাজ? এও কি এমন কোনো বিষয়ে যে, তা শিখতে হবে, জানতে হবে? বাইরে গিয়ে ঝেড়ে আসব। তিনি বললেন, এ কারণেই তো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। এখন বুঝতে পারছি, তুমি দস্তরখানা ঝাড়ার নিয়ম জানো না। আমি বললাম, তাহলে আপনি শিখিয়ে দিন।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, এও শেখার মতো একটি বিষয়, এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি।

অতঃপর তিনি দস্তরখানা খুলে গোশতের বড় ও ছোট টুকরোগুলোকে একদিকে রাখলেন। গোশতযুক্ত হাড্ডিগুলোকে একদিকে আর গোশতবিহীন হাড্ডিগুলোকে একদিকে রাখলেন। রুটির বড় টুকরোগুলোকে একদিকে আর ছোট ও ঝুরা টুকরোগুলোকে অন্যদিকে রেখে বললেন, দেখ, এই চার প্রকারের জন্য চারটি পৃথক জায়গা আছে। গোশতের টুকরোগুলো ওখানে রাখ।

বিড়ালের জানা আছে যে, খাবার শেষ হলে উচ্ছিষ্ট ওখানে রাখা হয়; সে সময় মতো গিয়ে খেয়ে নেয়। আর হাড্ডিগুলোর জায়গা অমুক স্থানে; মহল্লার কুকুরগুলোর জায়গা চেনা আছে, ওরা জায়গা মতো গিয়ে তা খেয়ে নেয়। এই বড় রুটির টুকরোগুলো আমি দেয়ালের ওপর রেখে দেই; কাক, চিল ও অন্য পাখিরা সময় মতো এসে এগুলো খেয়ে যায়। রুটির এসব ছোট ও মিহি টুকরোগুলো আমি পিঁপড়ার গর্তের মুখে রেখে দেই, ওরা তা খেয়ে নেয়।

অতঃপর তিনি বললেন, এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার রিজিক। এগুলোকে নষ্ট হতে দেয়া ঠিক নয়।

আমার আব্বাজান বললেন, সেদিনই আমার প্রথম জানা হলো যে, দস্তরখানা উঠানোও একটি বিষয়; আর তাও শিখে নেয়ার প্রয়োজন আছে।

আমাদের অবস্থা

আজ আমাদের অবস্থা এই যে, দস্তরখানা সরাসরি ডাস্টবিনে নিয়ে ঝেড়ে আসি। আল্লাহ তা'আলার রিজিকের কোনো তোয়াক্কা করি না, কোনো সম্মান করি না। মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীরাও আল্লাহর মাখলুক। তাদের জন্যও এই একই রিজিক আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আমরা যদি খেয়ে শেষ করতে না পারি, তাহলে তাদের জন্য রেখে দেয়া উচিত।

পুরাকালে শিশুদেরকেও শিক্ষা দেয়া হতো যে, দেখ, এগুলো আল্লাহর রিজিক, এগুলোর সম্মান করো। কোথাও যদি রুটির টুকরো পড়ে থাকতে দেখা যেত, সঙ্গে সঙ্গে তা তুলে নিয়ে আদবের সাথে চুমু খেয়ে কোনো উঁচু স্থানে রেখে দেয়া হতো।

কিন্তু যতই পশ্চিমা সভ্যতার প্রাধান্য আমাদের সমাজে বিস্তার লাভ করছে, ততই ইসলামী আচার-আচরণ বিদায় নিতে শুরু করেছে।

নবীজি (সাঃ)-এর বাণী, খাবার যদি পছন্দ হয়, তাহলে তা খেয়ে নাও। অপছন্দ হলে কমপক্ষে তার দোষচর্চা করো না, তার প্রতি অবজ্ঞা ও অসম্মান প্রদর্শন করো না। এই সুন্নতটিকে আজ আবার জীবিত তথা চালু করার প্রয়োজন পড়েছে।

এসব কথা শুধু কোনো গল্প-গুজব নয়; বরং আমল করার বিষয়। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত রিজিকের আদব ও এহতেমাম করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। বিশেষত ঐ আদব ও শিষ্টাচারের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত, যা নবীজি (সাঃ) আমাদের শিখিয়ে গেছেন এবং যা আমাদের দ্বীনের অংশ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আর ঐ পশ্চিমা জাতি আমাদের উপর সভ্যতার নামে অসভ্যতার যে আপদ চাপিয়ে দিয়েছে, তা থেকে মুক্তি লাভের উপায় খুঁজে বের করা কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকেব তাওফীক দান করুন। আমীন!

সিরকাও একটি তরকারি

হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, একবার হযরত নবী করিম (সাঃ) ঘরে এসে স্ত্রীকে বললেন, কোনো তরকারি আছে কি? স্ত্রী বললেন, সিরকা ব্যতীত অন্য কিছু তো আমাদের ঘরে নেই। শুধু সিরকা আছে। হুজুর (সাঃ) বললেন, তা-ই নিয়ে এসো।

হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, নবীজি (সাঃ) ঐ সিরকা দিয়েই রুটি খেতে শুরু করলেন আর বারবার বলতে লাগলেন, 'সিরকা একটি উত্তম সালুন, সিরকা একটি উত্তম সালুন।'

নবীজির ঘরের অবস্থা

এই হলো নবীজির (সাঃ) ঘরের অবস্থা। রুটি আছে; কিন্তু তা খাওয়ার সালুন নেই। অথচ বর্ণিত আছে, তিনি স্ত্রীগণের এক বছরের খোরাকি একসঙ্গে দিয়ে দিতেন। কিন্তু তারাও তো নবীজিরই স্ত্রী ছিলেন। তাদের দান-ছদকার হাত এতবেশি প্রশস্ত ছিল যে, খোদ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোনো কোনো সময় তিন-চার মাস পর্যন্ত তাদের ঘরে আগুন জ্বলেনি। মাত্র দু'টি বস্তুর উপর তাঁদের দিন গুজরান হতো– একটি খেজুর, অপরটি পানি। (বোখারী)।

নেয়ামতের কদর

এতে বোঝা যায় যে, হুজুর (সাঃ) প্রাপ্ত সব নেয়ামতেরই কদর করতেন, শোকর করতেন। কেননা, সাধারণত সিরকা কোনো সালুন হিসেবে ব্যবহার হয় না, বরং জিহ্বার স্বাদ বৃদ্ধির জন্য লোকেরা তরকারির সাথে মিশিয়ে খেয়ে থাকে। কিন্তু নবীজি (সাঃ) এই সিরকাযোগেই রুটি খেলেন এবং সিরকার প্রশংসা করে বললেন, এই সিরকা বড় উৎকৃষ্ট সালুন! এই সিরকা বড় উৎকৃষ্ট সালুন!!

খাদ্য ও রান্নাকারীর প্রশংসা

এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় আলিমগণ লিখেছেন, যদি কেউ এই নিয়তে সিরকা খায় যে, এটি হুজুর (সাঃ) খেয়েছেন এবং এর প্রশংসা করেছেন; তাহলে সে সওয়াব লাভ করবে।

এ হাদীস থেকে অপর একটি মাসআলা বের হয়। তাহল, যে খাবার কারো পছন্দ হয়, ভালো লাগে, তার কিছুটা প্রশংসাও করা উচিত। আর এই প্রশংসার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার শোকর করা যে, তিনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের তা দান করেছেন।

দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, এর কারণে রান্নাকারীর মনে প্রফুল্লতা তৈরি হয়; এটাও খানার একটি আদব এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন যেন না হয় যে, উদর পূর্ণ করে, জিহ্বার তৃপ্তি মিটিয়ে এখন ওঠে যাচ্ছি এমনভাবে যে, মুখে শোকরের একটি শব্দও বের হচ্ছে না, কৃতজ্ঞতার কোনো চিহ্নও ফুটে উঠছে না।

নবীজি (সাঃ)-এর অবস্থা দেখুন। সিরকাযোগে রুটি খেয়ে কী প্রশংসাই না তিনি করলেন।

বস্তুত একজন রান্নাকারী যখন খাবারের পেছনে কিছুটা মেহনত করল এবং সে নিজেকে আগুনের পাশে আবদ্ধ রেখে আপনার জন্য খাবার প্রস্তুত করল, তখন কি তার এতটু পাওনাও সাব্যস্ত হয় না যে, আপনি মুখে মুখে তার একটু প্রশংসা করবেন ও তার প্রাণশক্তিকে চাঙ্গা করে দিবেন। যে ব্যক্তি সামান্য প্রশংসার বাক্যও উচ্চারণ করে না, সে নিতান্তই কৃপণ ব্যক্তি।

একটি ঘটনা

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই সাহেব (রহঃ) একবার নিজের একটি ঘটনা শোনালেন যে, এক ব্যক্তি আমার কাছে আসা-যাওয়া করত। সে এবং তার স্ত্রী আমার সঙ্গে এছলাহী সম্পর্কও গড়ে তুলেছিল। একদিন তারা আমাকে তাদের ঘরে দাওয়াত করল। আমি সেখানে গিয়ে আহার করলাম। খানা খুবই সুস্বাদু ও রুচিকর ছিল। হযরতের স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল, তিনি খাবার ও খাবার প্রস্তুতকারীর খুব প্রশংসা করতেন। এতে আল্লাহর শোকর ও রান্নাকারীর মনজয় দুটোই হয়ে যেত।

সুতরাং আজ যখন তিনি খাবার খেয়ে অবসর হলেন, তখন লোকটার স্ত্রী পর্দার আড়াল থেকে হযরতকে সালাম করল। হযরত তাকে বললেন, আজ আপনি বড় মজাদার ও উৎকৃষ্ট খাবার রানা করেছেন। খেতে বসে বড় স্বাদ পেয়েছি আজ। হযরত বললেন, এই কথা বলার সাথে সাথে পর্দার আড়াল থেকে কান্না ও হেঁচকির আওয়াজ আসতে লাগল। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম না যে, আমার কোন্ কথায় তার কষ্ট হলো এবং তার মন ভাঙ্গল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? মহিলা বহু কষ্টে কান্না থামিয়ে বললেন, হযরত! চল্লিশ বছরেও আমি তার (স্বামীর) জবান মোবারক থেকে এই ধরনের একটি বাক্যও শ্রবণ করিনি যে– "আজ খানা বড় ভাল হয়েছে।" এখন হঠাৎ করে যখন আপনার মুখে বাক্যটি শুনলাম, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কান্না বেরিয়ে এল।

লোকটা যেহেতু হযতের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, তাই হযরত তাকে ডেকে বললেন, আল্লাহর বান্দা! এমন কৃপণ মানুষও কী আছে, কারো প্রশংসায় যার মুখ থেকে কখনো এমন দু'টি শব্দ বের হয় না, যার দ্বারা তার মন প্রফুল্ল হতে পারে। সুতরাং খাওয়ার পর খাবার ও খাবার প্রস্তুতকারীর প্রশংসা করা প্রয়োজন, যাতে খোদার শোকর ও রান্নাকারীর মনজয় দুটোই হয়ে যায়।

উপহার পেয়ে প্রশংসা করা

সাধারণভাবে মানুষের এই অভ্যাস পরিলক্ষিত হয় যে, যখন তাকে কোনো উপহার পেশ করা হয়, তখন সে বলে, আরে, এর আবার কী প্রয়োজন ছি? আপনি তো একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন।

কিন্তু আমাদের হযরত ডাঃ সাহেব (রহঃ)-কে দেখেছি, যখন তার

কোনো অকৃত্রিম বন্ধু আন্তরিকতার সাথে তার সম্মুখে কোনো উপহার সামগ্রী পেশ করত, তখন তিনি এতে কোনো কৃত্রিম ভাব প্রকাশ করতেন না; বরং এর প্রতি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতেন। আর বলতেন, ভাই! তুমি তো এমন একটা জিনিস নিয়ে এসেছ, যা আমার সত্যিই প্রয়োজন ছিল।

একবার হযরতের কাছে আমি একটি কাপড় নিয়ে গেলাম। তখন আমার তাতে এ ধারণা হয়নি যে, তিনি এর উপর এত সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। আমি যখন তার খেদমতে কাপড়টি রাখলাম, তখন তিনি বললেন, আমার এমন একটি কাপড়ের সত্যিই প্রয়োজন ছিল। আমি এর সন্ধানও পেয়েছি। আর যে রঙ তুমি বাছাই করেছ, আমার তা খুই পছন্দ হয়েছে। আর এই কাপড়টাও খুবই উৎকৃষ্ট।

তিনি প্রায়ই বলতেন, যখন কোনো ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে কোনো উপহার পেশ করে, তখন তাকে এমন কিছু বলো, যাতে তার ভালোবাসার মূল্য হয়ে যায় এবং তার দিল খুশি হয়ে যায় যে, তার জিনিসটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

আর হাদীস শরীফে যে কথাটা উল্লেখ হয়েছে, তা হচ্ছে, "উপহার আদান-প্রদান করো ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করো।"

এটা তো তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন উপহার গ্রহণ করার পর উপহার সামগ্রী ও দাতার প্রশংসা করা হবে।

বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও আবশ্যক

এক হাদীসে হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি বান্দার শোকর করে না, সে আল্লাহর শোকরও আদায় করে না।" (তিরমিযী)

এই হাদীস দ্বারা জানা গেল, কোনো ব্যক্তি যখন কারো সাথে এখলাছ ও মুহব্বতের আচরণ করে এবং তাতে তার কোনো উপকার হয়, তখন কমপক্ষে মুখে হলেও উপকারকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তার প্রশংসায় দু'টি শব্দ বলে দেয়া চাই। এটা সুন্নত। কেননা, এ সবকিছু হুজুর (সাঃ)-এর শিক্ষা।

আমরা যদি এসব শিক্ষা মেনে চলি, তাহলে দেখতে পাব, পারস্পরিক মুহব্বত কত বৃদ্ধি পায়, সম্পর্কের মাঝে কত সুখ পয়দা হয় এবং শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি দূর হয়ে যায়। শুধু একটাই শর্ত, নবীজির শিক্ষার ওপর আমল হওয়া চাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন!

নবীজির সতালো সন্তানকে আদব শিক্ষাদান

হাদীসটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আমর বিন সালামা (রাঃ) তা বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন হুজুর (সাঃ)-এর সতালো ছেলে। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)-এর প্রথম স্বামী ছিল হযরত আবু সালামা। তার ইন্তিকালের পর হুজুর (সাঃ) উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন। আর এই আমর বিন সালামা আবু সালামার ঔরসজাত সন্তান। হুজুরের সঙ্গে উম্মে সালামার বিয়ের পর আমর বিন সালামা হুজুরের কাছে চলে আসেন। আর এভাবেই তিনি নবীজির সতালো সন্তানে পরিণত হন এবং নবীজির ঘরে লালিত-পালিত হন।

আমর বিন সালামা (রাঃ) বলেন, আমি যখন শিশু ছিলাম এবং হুজুরের তত্ত্বাবধানে জীবনযাপন করছিলাম, তখন একবার আমি হুজুরের সঙ্গে খেতে বসলাম। খাওয়া চলাকালে আমার হাত বরতনের সবদিকে যাচ্ছিল। এক লোকমা এদিক থেকে খাচ্ছিলাম, অপর লোকমা অন্যদিক থেকে। তৃতীয় লোকমা ভিন্ন কোনো দিক থেকে। হুজুর যখন আমার এই অবস্থা দেখলেন, তখন তিনি আমাকে বললেন, বৎস! প্রথমে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো এবং বিস্‌মিল্লাহ বলো। অতঃপর ডান হাতে নিজ পার্শ্ব থেকে খাও। অর্থাৎ বরতনের যে পাশ তোমার দিকে, সেদিক থেকে খাও।

নিজ পার্শ্ব থেকে খাওয়া-ই আদব

এই হাদীসটিতে নবীজি (সাঃ) তিনটি আদব বর্ণনা করেছেন। প্রথম আদব, বিস্‌মিল্লাহ বলে আহার শুরু করা। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় আদব, ডান হাতে খাওয়া। এ বিষয়েও কিছু পূর্বেই বর্ণনা হয়েছে। তৃতীয় আদব এই বর্ণিত হচ্ছে যে, নিজ পার্শ্ব থেকে খাও। এদিক-ওদিক থেকে খেও না। এই আদবটির ওপর নবীজি (সাঃ) অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর একটি কারণ তো একেবারেই সুস্পষ্ট। আর তা এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি খানা তার নিজের পার্শ্ব থেকে খায় এবং যদি তারপরও কিছু খাবার বেঁচে যায়, তাহলে তা দৃষ্টিকটু হবে না। পক্ষান্তরে যদি বিভিন্ন দিক থেকে খায় এবং সে অবস্থায় কিছু খাবার বেঁচে যায়, তাহলে তা দৃষ্টিকটু হবে। অপরের জন্য তা অরুচিকর হবে। ফলে তা ফেলে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে, নিজের সামনে থেকে খাও।

খাবারের মাঝখানে বরকত অবতীর্ণ হয়

এক হাদীসে নবীজি (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, খাবার যখন সামনে দেয়া হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ খাবারের মাঝখানে বরকত অবতীর্ণ হয়। কেউ যদি মাঝখানে হাত দিয়ে খাবার তুলে নেয়, তাহলে এর অর্থ এই হবে যে, এখন থেকে বরকত অবতীর্ণ হওয়া শেষ হয়ে গেল।

সুতরাং যদি নিজ নিজ পার্শ্ব থেকে গ্রহণ করা হতো, তাহলে বরকত দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হতো। অবশ্য এখন এই প্রশ্নও হতে পারে যে, এই বরকতটা কী? আর মাঝখানে তা অবতীর্ণ হলোই বা কিভাবে? এগুলো এমন যে, আমাদের এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তা বুঝে ওঠতে পারব না। সোজা কথা, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও প্রজ্ঞাধীন বিশেষ অবস্থা। তিনি এবং তার রাসূলই (সাঃ) ভালো জানেন। আমাদের এসব বিষয়ে নিমগ্ন হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাদের বাতানো আদব অনুযায়ী কাজ করাই আমাদের কর্তব্য। অর্থাৎ, "নিজের সামনে থেকে খাও, এদিক-ওদিক থেকে নয়" এই নিয়মেই আমরা খেয়ে যাব।

পদ একাধিক হলে এদিক-ওদিক হাত বাড়ানো বৈধ

উল্লিখিত আদব তখন, যখন খাবার হবে এক ও অভিন্ন পদের। কিন্তু যখন খাবার হবে বিভিন্ন পদের, তখন বরতনের বিভিন্ন দিকে রক্ষিত নিজের পছন্দ মতো খাবারের দিকে হাত বাড়ানো বৈধ, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

সাহাবী হযরত আকরাশ বিন যাঈর (রাঃ) বলেন, একবার আমি হুজুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি কারো বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাচ্ছিলেন। আমাকেও সঙ্গে নিলেন। আমরা ওখানে পৌঁছার পর আমাদের সামনে ছরিদ রাখা হলো। ছরিদ বলা হয় রুটির টুকরো গোশতের ঝোলে ভিজিয়ে রান্না করা খাবারকে। নবীজির এটা বেশ পছন্দ ছিল। আর তিনি এর অনেক ফজিলতও বর্ণনা করেছেন যে, ছরিদ খুব উত্তম খাবার।

যাই হোক, হযরত আকরাশ (রাঃ) বলেন, আমি যখন ছরিদ খেতে শুরু করলাম, তখন প্রথম ভুল তো এই করলাম যে, শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ বললাম না। তখন নবীজি (সাঃ) বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করো, অর্থাৎ বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু করো। এরপর দ্বিতীয় ভুল এই করলাম যে, এক

লোকমা বরতনের এপাশ থেকে নিলাম অপরটি অপর পাশ থেকে নিলাম।

নবীজি (সাঃ) আমার এই আচরণ দেখে বললেন, 'হে আকরাশ! একই স্থান থেকে খাও। কেননা, খাবার তো এক ও অভিন্ন।' ফলে আমি একই স্থান থেকে খেতে শুরু করলাম। খানা শেষ হলে আমাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার খেজুর ভর্তি একটি বড় থালা রাখা হলো। এগুলোর রঙ ভিন্ন, স্বাদ ভিন্ন, কোনোটা উন্নত, কোনোটা মধ্যম ধরনের; আবার কোনোটা ভেজা, কোনোটা শুকনো।

যেহেতু একটু পূর্বেই নবীজি (সাঃ) আমার হাত ধরে শিক্ষাদান করেছেন যে, নিজের সামনে থেকে খাও, এই কারণে আমি শুধু আমার সম্মুখস্থ খেজুরই খাচ্ছিলাম। অথচ তখন আমি হুজুর (সাঃ)কে দেখতে পাচ্ছিলাম যে, তিনি বরতনের বিভিন্ন দিক থেকে খাচ্ছিলেন; কখনো এপাশ থেকে, কখনো ওপাশ থেকে। কিন্তু হুজুর (সাঃ) যখন আমাকে একই স্থান থেকে খেতে দেখলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলে– "হে আকরাশ! যেখান থেকে ইচ্ছে খাও। কেননা, এখানকার খেজুরগুলো বিভিন্ন রঙের। তাই এখাবার বিভিন্ন স্থান থেকে খাওয়া অন্যায় নয়।"

যাই হোক, এই হাদীসে নবীজি (সাঃ) এই আদব শেখালেন যে, এক রকম খানা হলে একই স্থান থেকে খেতে হবে, একাধিক রকমের খানা হলে রুচি ও পছন্দ মতো বিভিন্ন দিক থেকে খেতে দোষ নেই।

বাঁ হাতে খাওয়া অবৈধ

হযরত ছালামা বিন আকওয়া (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবীজি (সাঃ)-এর সম্মুখে বসে বাঁ হাতে খাচ্ছিল। নবীজি (সাঃ) তাকে ডান হাতে খেতে বললেন। সে বলল, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। লোকটা আসলে একজন মুনাফিক। তদুপরি তার ডান হাতে তখন কোনো উজরও ছিলো না। অনর্থক সে মিথ্যা বলছিলো যে, আমি ডান হাতে খেতে পানি না।

কিছু লোক এমন আছে, যারা নিজের ভুল মেনে নিতে পারে না; বরং নিজের কথা বা কাজের ওপর অটল থেকে যায়। লোকটি তাই বাঁ হাতেই খাচ্ছিল। নবীজির নিষেধাজ্ঞার পরও সে ফিরতে পারেনি। নবীজির কথা লোকটির মনোপুত হয়নি। আর এ কারণেই লোকটি পরিষ্কার শব্দে বলে দিল, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। এভাবে সে নবীজির সামনেই মিথ্যা বলে ফেলল।

বস্তুত নবীজির সম্মুখে মিথ্যা বলা, ভুল বলা, বিনা কারণে নিজের ভুলকে গোপন করা; আল্লাহর কাছে ভীষণ অপছন্দ। ফলে নবীজি তাকে বদদোয়া করে বললেন, "জীবনেও যেন তোমার ডান হাতে খাওয়ার শক্তি না আসে।" তেমনটিই হয়েছিল লোকটির ভাগ্যে। বর্ণনায় পাওয়া যায়, এরপর যখনই সে খাওয়ার জন্য ডান হাত মুখ পর্যন্ত ওঠাবার চেষ্টা করেছে, পারেনি। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে রক্ষা করুন। আমীন!

ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত

নিয়ম হল, যদি মানুষ হিসেবে কারো কোনো ভুল হয়ে যায়, অতঃপর সে তা স্বীকার করে লজ্জিত হয়, তাহলে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যদি ভুল করার পর আবার ভুল করে এবং বুক ফুলিয়ে তা সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং যদি তা হয় নবীর সম্মুখে, তাহলে এ হবে মারাত্মক গোনাহ। হুজুর (সাঃ)-এর কারো জন্য বদদোয়া করা বিরল ও দুষ্প্রাপ্য ঘটনা। তিনি তো তার প্রাণের দুশমনদের জন্যও বদদোয়া করেনি। যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাঁর ওপর তরবারি উঁচিয়েছে এবং তাঁর দিকে তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, তিনি তাদের জন্যও বদদোয়া করেননি; বরং এই দোয়া করেছেন–

"প্রভু হে! হেদায়েত দান করো আমার কাওমকে। কেননা, তারা আমাকে চেনে না, জানে না।"

কিন্তু উল্লিখিত ক্ষেত্রে নবীজি (সাঃ)-এর ওহীর মারফত জানা হয়ে গিয়েছিল যে, লোকটি অহংকারবশত গোঁড়ামি করে মুনাফীকির ভিত্তিতে ডান হাতে খেতে অস্বীকার করছে। মূলত তার কোনো ওজর নেই। এই কারণেই নবীজি (সাঃ) তার ওপর বদ দোয়ার শব্দ উচ্চারণ করেছেন। আর তা সঙ্গে সঙ্গে কবুলও হয়ে গেছে।

নিজের ভুলকে আড়াল করার চেষ্টা করা ঠিক নয়

আমাদের হযরত ডাঃ আবদুল হাই বলতেন, মানুষ যদি ভুল ও গোনাহ করে ফেলে, এরপর সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো বুজুর্গ বা কোনো আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির কাছে চলে যায়, তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ওখানে গিয়েও যদি মিথ্যা বলে কিংবা নিজের ভুলকে আড়াল করার চেষ্টা করে, তাহলে এ হবে বিপজ্জনক পদক্ষেপ।

নবীগণের শান তো অনেক উঁচু; কখনো কখনো ওয়ারিশে নবীগণও জনসাধারণের ভেতরের সুপ্ত খবরাদী অবহিত হয়ে যান।

একবার ডাঃ আবদুল হাই সাহেব হযরত থানভী (রহঃ)-এর ঘটনা আমাদেরকে শুনিয়েছেন যে, একদা হযরতের মজলিস হচ্ছিল, তিনি ওয়াজ করছিলেন। এক ব্যক্তি ঐ মজলিসে দেয়াল কিংবা অন্য কিছুতে হেলান দিয়ে অহংকারের ভঙ্গিতে বসে কথা শুনছিল; এভাবে ঠেস লাগিয়ে, পা ছড়িয়ে বসা মজলিসের আদবের খেলাপ। মজলিসের কোনো এক ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার অর্থই হলো তার নিজের সংশোধন করা। সুতরাং কোনো ব্যক্তির ভুল ধরে সংশোধন করে দেয়া বয়ানকারীর কর্তব্য বটে।

যাই হোক, হযরত লোকটিকে সাবধান করে বললেন যে, এভাবে বসা মজলিসের আদবের খেলাফ। আপনি ঠিক করে আদবের সাথে বসুন। লোকটা ঠিক হয়ে না বসে ওজর দেখিয়ে বলল, হযরত! আমার কোমরে অসুবিধা, যার কারণে আমি এভাবে বসেছি।

বাহ্যত লোকটির বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল, আপনার ভুল ধরা ঠিক হয়নি; আমার অবস্থা সম্পর্কে আপনার জানা নেই; আমার কি কষ্ট তা আপনি কি করে জানেন? আপনার এভাবে ভুল ধরা ঠিক হয়নি।

হযরত ডাঃ সাহেব স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত থানভী (রহঃ)-কে দেখেছি, তিনি সেই মুহূর্তেই মাথা ঝুঁকালেন ও চক্ষু বন্ধ করলেন। একটু পর মাথা তুলে চোখ খুলে বললেন, ভাই সাহেব! আপনি মিথ্যা বলছেন, আপনার কোমরে বর্তমানে কোনো বিষ-বেদনা ও অসুবিধা নেই। আপনি মজলিস থেকে যেতে পারেন।

অতঃপর জোর করে ধরে তাকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। বাহ্যত মনে হবে, হযরতের এ বিষয়ে কী জানা আছে, কোমরে ব্যথা আছে কি নেই? তিনি কীভাবে জানবেন? কিন্তু কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে দেন। সুতরাং বুজুর্গদের কাছে মিথ্যা বলা কিংবা তাঁদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা মারাত্মক অন্যায়। ভুল হয়ে গেলে, ত্রুটি-বিচ্যুতি করে ফেললে মানুষ যদি অনুতপ্ত হয়ে খোদার দরবারে তওবা করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ সেই গোনাহ অবশ্যই ক্ষমা হয়ে যাবে।

মোটকথা, হযরত লোকটাকে মজলিস থেকে তুলে দিলেন। পরে সে স্বীকার করেছিল যে, সত্যিই তার কোমরে তখন কোনো অসুবিধা ছিল না।

হযরত সঠিক বলেছিলেন। আমি শুধু আমার কথাটা টিকিয়ে রাখার জন্য এরূপ বলেছিলাম।

বড়দের সাথে কিছুতেই বেআদবী করা উচিত নয়

লক্ষ্য করে দেখুন, এই পৃথিবীতে এমন কে আছে, যার গোনাহ বা ভুল-ত্রুটি হয় না? নেই। মানুষ মাত্রই এসবের শিকার। কেউ যদি বুজুর্গদের কথা মত না চলে, সেও কোনো না কোনো মূহূর্তে তাওবার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে; আর আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বুজুর্গদের শানে বেআদবী করা, তাদের উপর আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগ করা ও নিজের ভুলকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করা এত বড় অন্যায় যে, কখনো এর কারণেও ঈমান চলে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের রক্ষা করুন, আমীন!

সুতরাং কোনো আল্লাওয়ালা ব্যক্তির কোনো কথা যদি পছন্দ না হয়, তাতে তেমন অসুবিধা নেই। কিন্তু এর কারণে তাঁর সাথে এমন কোনো কথা বলা ঠিক নয়, যা তার শানে বেআদবী ও অসম্মানজনক হয়। এমন না হয় যে, ঐ শব্দটা আল্লাহ তা'আলাও অপছন্দের কারণে লোকটির ঈমান ও জীবন ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেফাজত করুন। আমীন!

আজকাল মানুষের স্বভাব এই হয়েছে গেছে যে, ভুলকে ভুল হিসেবে মেনে নিতেও অস্বীকার করে বসে। গোনাহকে গোনাহ হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয় না। একে তো চুরি তার উপর আবার সিনাজুরি। একদিকে গোনাহ করেছে, অপরদিকে তাকে শুদ্ধ বলে প্রমাণিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। উদাহরণত কোনো বুজুর্গের শানে এরূপ বলে দেয়া যে, তিনি তো দোকানদার ছিলেন; অমুক ছিলেন, তমুক ছিলেন ইত্যাদি। এরূপ দোষচর্চা ও শব্দ প্রয়োগ করা ভয়ানক ব্যাপার। এগুলো থেকে নিজেদেরও বেঁচে থাকা প্রয়োজন, অপরকেও বাঁচাবার চেষ্টা করা দরকার।

দুই খেজুর এক সঙ্গে খাবে না

হযরত জাবাল বিন সুহাইমিন (রাঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর শাসনামলে আমাদের উপর একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কিছু খেজুরের ব্যবস্থা

হলো। আমরা যখন খেজুর খাচ্ছিলাম, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ইরশাদ করলেন, দু'টি করে খেজুর একযোগে মিলিয়ে খেও না। কেননা, নবী (সাঃ) এভাবে দু'টি করে খেজুর এক সঙ্গে মিলিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন। দু'টি করে খেজুর একযোগে মিলিয়ে খাওয়াকে আরবীতে 'ক্বিরান' বলা হয়। হুজুর (সাঃ) এভাবে খাওয়া এ কারণে নিষেধ করেছিলেন যে, সকলের খাওয়ার জন্য যে খেজুর সম্মুখে রাখা হয়েছে, তাতে সকলের অধিকার সমান।

সুতরাং কেউ যদি একত্রে দু'টি করে খায় আর অন্যরা একটি করে খায়, তাহলে অন্যের অধিকার খর্ব করা হলো। আর এটি বৈধ নয়। তবে সকলেই যদি দু'টি করে খায়, তাহলে সকলের জন্যই বৈধ হবে। মোটকথা, নিরাপদ পন্থা হলো, সকলে একই নিয়মে খাবে। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, অপরের হক যেন নষ্ট না হয়। কেননা, এটা অবৈধ।

যৌথ জিনিস ব্যবহারের নিয়ম

আলোচ্য হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি নিয়ম বর্ণনা করেছেন যে, যেসব জিনিস যৌথ, যা থেকে সকলের উপকার গ্রহণের হক রয়েছে, তা থেকে এককভাবে কেউ অতিরিক্ত ফায়দা গ্রহণ করতে পারবে না। তাতে অপরের হক বিনষ্ট হবে; আর এটা বৈধ নয়।

এই নিয়মের সম্পর্ক শুধু খেজুরের সঙ্গেই নয়; বরং জীবনের ঐ সকল বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে, যেখানেই সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য বস্ত-সামগ্রী রয়েছে। যেমন, আজ-কালকার ভোজ অনুষ্ঠানে সেল্‌ফ সার্ভিস 'নিজ হাতে গ্রহণ' পদ্ধতি চালু আছে। অর্থাৎ আহারকারী নিজে খাবার নেবে ও খাবে। এই খাবারের মধ্যে দাওয়াতপ্রাপ্ত প্রতিটি সদস্যের সমাণ হক রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি নিজ হাতে কিছু অতিরিক্ত খাবার নিয়ে নেয়, তাহলে উক্ত নিয়মের অধীনে না জায়েজ সাব্যস্ত হবে এবং হাদীস শরীফে বর্ণিত 'ক্বিরান'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যা করতে নবীজি (সাঃ) নিষেধ করেছেন।

নিজ বর্তনের খাবার সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে

এই নিয়মটির দ্বারা উম্মতকে এই শিক্ষা দান করা উদ্দেশ্য যে, একদল মুসলমানের কর্তব্য হলো, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করা। এমন যেন

না হয় যে, সে অপরের ওপর 'ডাকাতি ও স্বত্ব' কায়েম করে নেয়। চাই ঐ অধিকারটা খুব ক্ষুদ্রই হোক না কেন।

সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করবে, তখন সে অপরের হক দৃষ্টিতে রেখে কাজ করবে। এমন যেন না হয় যে, শুধু আমার জুটে গেলেই হলো; চাই অন্যের জুটুক কিংবা না জুটুক। আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতি শফী সাহেব (রহঃ) দস্তরখানে বসে এই মাসআলাটিই বর্ণনা করতে করতে বলেছেন–

"যখন দস্তরখানে খানা রাখা হবে, তখন দেখতে হবে যে, এই দরস্তখানায় কতজন লোক খাবে; আর যা কিছু দরস্তখানে মজুদ আছে, যদি তা সকলের মাঝে বণ্টন করা হয়, তাহলে প্রত্যেকে কতটুকু করে পাবে। এরপর সেই হিসাব মতে প্রত্যেকে যার যার অংশগ্রহণ করবে। কেউ যদি আরো অতিরিক্ত গ্রহণ করে, তাহলে হাদীস শরীফে বর্ণিত 'ক্বিরান'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তা নাজায়েয সাব্যস্ত হবে।"

যানবাহনে অতিরিক্ত সিট দখল করা অবৈধ

অনুরূপভাবে একবার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান (রহঃ) একটি মাসআলা বর্ণনা করলেন যে, তোমরা রেলগাড়িতে ভ্রমণ করে থাকো; ওখানে অবশ্যই লেখা দেখেছো যে, একটি কামরায় বিশজন যাত্রী ভ্রমণ করবেন। এখন তুমি সর্বাগ্রে প্রবেশ করে তিন/চারটি সিট দখল করে নিজের জন্য খাছ করে নিলে এবং বিছানা পেতে শুয়ে পড়লে। এর অনিবার্য ফলাফল এই হলো যে, অন্যান্য যাত্রীদের সিট হলো না; তাদের অনেকে দাঁড়িয়ে আর তুমি শুয়ে ভ্রমণ করছো। এও 'ক্বিরান' শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাজায়েয হবে। তোমার অধিকার তো ছিল শুধু একটি সিট। কিন্তু তুমি যখন একাধিক সিট দখল করে অন্যদের অধিকার খর্ব করলে, তখন তুমি একত্রে দু'টি গুনাহে লিপ্ত হয়েছো। প্রথমত, এক টিকিটে একাধিক সিট দখল করার অপরাধ। দ্বিতীয়ত, মুসলমান ভাইয়ের অধিকার নষ্ট করার অপরাধ। এভাবে প্রথমটি দ্বারা আল্লাহর হক নষ্ট হলো আর দ্বিতীয়টির দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হলো।

এটি এমন একটি অপরাধ, যা বান্দার কাছ থেকে মাফ করানোও মুশকিল। আর বান্দার হক ততক্ষণ পর্যন্ত মাফ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত হকওয়ালা মাফ না করে; শুধু তওবার দ্বারা মাফ হয় না। পরে কখনো যদি

তওবা করার তাওফীক হয়, তখন ঐ ব্যক্তিকে আর কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না; সুতরাং তখন ক্ষমার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। এই কারণেই এই সব ব্যাপারে প্রথম থেকেই যত্নশীল হওয়া চাই। কোরআনে কারীম এ বিষয়ে একাধিক স্থানে সতর্ক করেছে যে, পার্শ্ব বন্ধু তথা সরফ সঙ্গীর হক আদায় করো। পার্শ্ব-বন্ধু তাকে বলা হয়, যে ভ্রমণ পথে রেলে, বাসে কিংবা জাহাজে ক্ষণিকের তরে আমাদের পাশে সিটে অবস্থান নেয়; এরও হক আছে, তা আদায় করে দেয়াই কর্তব্য। হক নষ্ট হতে দেয়া কিছুতেই উচিত নয়। এর সাথে অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবহার করতে হবে। কেননা, ক্ষণিকের ভ্রমণ একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু কেউ যদি অল্পের জন্য চলার পথে নিজের ওপর এরূপ গোনাহ চাপিয়ে নেয়, তাহলে ক্ষমা করানো মুশকিল হয়ে পড়ে। সারা জীবন তা তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে। এগুলো সবই 'ক্বিরান' শব্দের অন্তর্ভুক্ত ও না জায়েজ সাব্যস্ত হবে।

যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্যে হিসাব-নিকাশ শরীয়তসম্মত হওয়া আবশ্যক

আজকাল এ-ও এক মহামারীর রূপ ধারণ করেছে যে, কয়েক ভাই মিলে যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য করে। হিসাব-নিকাশ কিছুই সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে না। বরং বলে বেড়ায় যে, আমরা সবাই ভাই ভাই, হিসাব-কিতাবের কী প্রয়োজন? হিসাব-কিতাব কিসের। কার কত অংশ এবং কে কত পাবে লিপিবদ্ধ নেই। মাসিক কাকে কতটুকু মুনাফা দেয়া হবে, তার হিসাব নেই। একেবারে লাগামহীন মুআমালা চলতে থাকে। যার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, কিছুদিন তো মুহাব্বতের সম্পর্ক চলে, অল্পদিনেই তাতে অভিযোগ-অনুযোগ শুরু হয়ে যায়; অমুকের ছেলে-মেয়ে বেশি। সে বেশি নিচ্ছে; অমুকের কম, সে কম নিচ্ছে। অমুকের বিয়েতে এত খরচ হলো আর আমার ছেলের বিয়েতে কম। অমুক ব্যবসা থেকে এত এত ফায়দা লুটে নিচ্ছে, আমি কিছুই পাচ্ছি না ইত্যাদি ধরণের কথা-বার্তা হয়ে যায়।

এইসব কিছু এ কারণেই হলো যে, আমরা নবীজির শিক্ষা থেকে বহুদূর চলে গেছি। স্মরণ রাখুন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব হলো, যৌথ কারবারের হিসাব সংরক্ষণ করা। হিসাব-কিতাব সংরক্ষণ না করা হলে নিজেও গোনাহগার হবে অপরকেও গোনাহগার বানাবে।

স্মরণ রাখুন, ভাইদের মাঝে লেন-দেনে যে আন্তরিকতা দেখা যায়, তা

অল্পদিন চলে, এরপরই শুরু হয়ে যায় ঝগড়া-ফাসাদ; যা আর সমাপ্ত হয় না কখনো। এমন বহু সমস্যা আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত আছে।

মালিকানায় শরীয়তসম্মত ব্যবধান আবশ্যক

কার মালিকানা কতটুকু, পৃথক পৃথক হিসাব থাকা জরুরি। এমনকি পিতা-পুত্রের মালিকানায়, স্বামী-স্ত্রীর মালিকানায় এই ব্যবধান জরুরি। হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেকের ঘর পৃথক পৃথক ছিল। হযরত বলতেন, আমার মালিকানা ও আমার স্ত্রীদের মালিকানা সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক করে চিহ্নিত করে রেখেছি। আর তা এভাবে যে, বড় স্ত্রীর ঘরে যেসব কিছু সামান রেখেছি তা তার; আর যা ছোট স্ত্রীর ঘরে রেখেছি সেগুলো তার; আর যা আছে খানকাতে সেগুলো আমার। এখনই যদি এই পৃথিবী থেকে আমাকে চলে যেতে হয়, তাহলে কউকেই কিছুই বলতে বা শুনতে হবে না। আলহামদুলিল্লাহ, সব কিছু যার যার স্থানে অবস্থান করছে।

হযরত মুফতি সাহেব (রহঃ) -এর অবস্থা

আমি আব্বাজান (রহ)-কেও এমনই দেখেছি যে, সব কিছুতেই মালিকানা স্পষ্ট করে দিতেন। শেষ বয়সে আব্বাজান একটি কামরায় চৌকি রেখেছিলেন। দিন-রাত ওখানেই কাটাতেন। আমরা সর্বদা তাঁর খেদমতে উপস্থিত থাকতাম। আমি দেখেছি, যখন প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস অন্য কামরা থেকে তার কামরায় এনে দিতাম, তখন প্রয়োজন সেরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, ওটা রেখে আসো। কখনো যদি ফিরিয়ে দিতে বিলম্ব হতো, তিনি না-রাজী প্রকাশ করে বলতেন, আমি তোমাদের বলেছি যে, ওটা ফিরিদে দাও; এখনো তা ফিরিয়ে দাওনি?

কখনো কখনো আমাদের মনে খেয়াল হতো, এত জলদী ফিরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন কী? একটু পরই তো ফিরিয়ে দেব। একবার আব্বাজান (রহঃ) নিজেই বললেন, আমি আসলে অসিয়তনামায় লিখে দিয়েছি যে, আমার কামরায় যা কিছু আছে, তা আমার মালিকানাধীন আর স্ত্রীর কামরায় যা কিছু আছে তা তার মালিকানাধীন।

সুতরাং যখন আমার কামরায় অপর কারো জিনিস এসে যায়, তখন আমার খেয়াল হল যে, অপরের জিনিস আমার ঘরে থাকার কারণে

সেটাকে আমার মালিকানাধীন মনে করা হয়। অথচ তা আমার নয়, অপরের। এ কারণেই আমি অপরের জিনিস ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

এসব কথাতো দ্বীনের অংশ। আজ তা আমরা দ্বীন থেকে বের করে দিয়েছি। এগুলো বড়দের কাছ থেকে শিখতে হয়। আর এসব কথা ঐ মৌলনীতি থেকে চয়ন করা হয়েছে, যা নবীজি (সাঃ) হাদীস শরীফে উল্লেখ করেছেন যে, তোমরা 'ক্বিরান' থেকে আত্মরক্ষা করো।

যৌথ জিনিসের ব্যবহার বিধি

আব্বাজান (রহঃ) বলতেন, ঘরের কিছু জিনিস যৌথ ব্যবহার্য, যা ঘরের প্রত্যেকে ব্যবহার করে থাকে। সেগুলোর জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা থাকে। যেমন গ্লাস রাখার একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। পেয়ালা রাখার একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। সাবান রাখারও অপর একটি জায়গা নির্দিষ্ট আছে।

তিনি আমাদের বলতেন, তোমরা এগুলো ব্যবহার করে অন্য জায়গায় ফেলে রাখো। তোমাদের জানা নেই যে, তোমাদের এই আমল গোনাহে কবীরাহ। কারণ, ঐ জিনিসগুলো যৌথ ব্যবহার্য। যখন অপর একজনের ঐ জিনিসগুলো ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে, তখন সে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে খুঁজবে কিন্তু পাবে না। ফলে তার কষ্ট হবে। মুসলমানকে এরূপ কষ্ট দেয়া গোনাহে কবীরা।

আমাদের বিবেক কখনো ওদিকে যায়নি যে, এ-ও গোনাহ। আমরা তো মনে করতাম, এ-তো দুনিয়াদারী কাজ-কাম, ঘরের এনতেজামী বিষয়। স্মরণীয় যে, জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যার সম্পর্কে ইসলামে দিক-নির্দেশনা নেই।

আমরা সকলে মাথা নিচু করে একটু চিন্তা করে দেখি যে, আমরা কি এসব বিষয়ের প্রতি যত্নশীল? অর্থাৎ যৌথ ব্যবহার্য বস্তু সামগ্রী ব্যবহার করার পর তাকে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিতে আমরা কি অভ্যস্ত, যাতে অপরের কষ্ট না হয়? খুবই সামান্য ব্যাপার; কিন্তু অসতর্কতার কারণে আমরা গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েছি। এর প্রধান কারণ তো হলো, আমাদের দ্বীনের ফিকির নেই। দ্বীনের প্রতি খেয়াল নেই। আল্লাহর সামনে উপস্থিতির অনুভূতি নেই। দ্বিতীয় কারণ হলো, এসব মাসায়েল সম্পর্কে আমাদের রয়েছে ব্যাপক অজ্ঞতা ও অবহেলা।

যাই হোক, এইসব কথা 'ক্বিরান' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এমনিতে তো হাদীসের ভাষ্য খুবই সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ দুই খেজুর একযোগে খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু তা থেকে এই মূলনীতিটা জানা গেল যে, এমন সব বিষয়, যাতে অপর মুসলমানের কষ্ট হয় কিংবা তার অধিকার খর্ব হয়, তা হাদীস শরীফে বর্ণিত 'ক্বিরান' শব্দের আওতায় এসে অবৈধ সাব্যস্ত হবে।

যৌথ শৌচাগারের ব্যবহার

কখনো এমন কথা এসে যায়, যা বলতে সংকোচবোধ হয়। কিন্ত দ্বীনের কথা বুঝতে-বুঝাতে লজ্জা করা ঠিক নয়। উদাহারণত কেউ শৌচাগারে গেল; কিন্তু ফারেগ হওয়ার পর তা পরিস্কার করে আসল না, ওভাবেই রেখে আসল। হযরত আব্বাজান (রহ) বলতেন, এই আমল গুনাহে কবীরাহ। কারণ, অন্য ব্যক্তি যখন শৌচাগার ব্যবহার করতে যাবে, তখন তার ঘৃণা আসবে, কষ্ট হবে। আর এই কষ্টের কারণ ঐ ব্যক্তিই হবে। ঐ ব্যক্তিই তাকে কষ্টে ফেলল। একজন মুসলমানকে কষ্ট দিয়ে সে গোনাহে কবীরায় লিপ্ত হলো।

অমুসলিমরা ইসলামী আদব ও শিষ্টাচার গ্রহণ করে নিয়েছে

আমি একবার ঢাকার সফরে আব্বাজানের সঙ্গে গিয়েছিলাম। ভ্রমণ ছিল বিমানে। পথে আমার টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলো। সকলের জানা আছে, বিমানে টয়লেটের ভেতরে হাত ধোয়ার স্থানে একটি বাক্য লেখা আছে, যার অর্থ ঃ বেসিন ব্যবহার করার পর তা কাপড় দ্বারা মুছে রাখুন; যাতে পরবর্তী জনের জন্য তা ঘৃণার কারণ না হয়। আমি টয়লেটে থেকে ফিরে এলাম, তখন আব্বাজান বললেন, টয়লেটে বেসিনের উপর যে বাক্যটি লেখা আছে, সেটি ঐ বাক্য-ই আমি যা তোমাদের বারবার বলি। অপরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করা দ্বীন। আর এটি আজ অমুসলিমরা গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ওদের আজ দুনিয়াতে উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করেছেন। আর আমরা আজ ঐ কথগুলোকে দ্বীন থেকে বের করে দিয়েছি, দ্বীনকে শুধু নামাজ-রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। পারস্পরিক আচার-আচরণ সংক্রান্ত এই আদব ও শিষ্টাচারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে রেখেছি। যার কারণেই আজ আমরা অবনতির ও অনগ্রসরতার শিকার হয়েছি ও হচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়াকে আসবাবের জগৎ বানিয়েছেন; এখানে যে যেমন আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সে রকমই ফল দান করবেন। গত বছর আমার লন্ডনের সফর হয়েছিল। লন্ডন থেকে ট্রেনে এডেনবারা যাচ্ছিলাম। পথে টয়লেটের যাওয়ার প্রয়োজন হলো। আমি যখন টয়লেটের কাছে গেলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, জনৈক ভদ্র ইংলিশ মহিলা দরজার সামনে দাড়িয়ে আছেন। আমি ভাবলাম, সম্ভবত টয়লেট এখন অবসর নেই। মনে হলো ঐ মহিলা অপেক্ষায় আছেন। খালি হলে তিনি ভেতরে যাবেন। আমি আমার সিটে ফিরে এলাম। দীর্ঘ সময় যখন এভাবে কেটে গেল যে, না কেউ ভেতর থেকে বের হচ্ছে; না ঐ মহিলা ভেতরে যাচ্ছে। তখন আমি আবার সেখানে গেলাম। দেখলাম, দরজায় লেখা আছে, ভেতরে অবসর, ভেতরে কেউ নেই। আমি ঐ ভদ্র মহিলাকে বললাম, আপনার প্রয়োজন থাকলে যেতে পারেন, টয়লেট খালি আছে। মহিলা বলল, আমি তো অন্য কারণে দাঁড়িয়ে আছি। আর তা হচ্ছে এই যে, আমি কিছুক্ষণ পূর্বে টয়লেট ব্যবহার করে এসেছি আর আমি পরিস্কার করার পূর্বেই স্টেশনে এসে থেমে গেছে। স্টেশনের নিয়ম হলো, এখানে থামা অবস্থায় পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির জন্য টয়লেট ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি তাতে পানি ঢেলে দেয়া ঠিক নয়। আমি এখন এই অপেক্ষায় আছি, যখন গাড়ি স্টেশন ছেড়ে যাবে, তখন আমি ভেতরে গিয়ে পরিস্কার করে বের হবো ও আমার সিটে গিয়ে বসব।

এখন একটু চিন্তা করে দেখা দরকার যে, ঐ মহিলা শুধু পরিস্কার করার জন্যই অপেক্ষা করছিল। আর তখন পর্যন্ত তা পরিস্কার করছিল না শুধু এই কারণে যে, সেটা নিয়মের খেলাফ কাজ হবে। এবার আমার আব্বাজানের কথা স্মরণ হলো। তিনি বলতেন, এতটুকু খেয়াল করা উচিত, যেন লোকজন পরিস্কার করে বের হয়।

এটি আসলে আমাদের দ্বীনেরই নির্দেশ, যাতে পরে আগমনকারীর কষ্ট না হয়। কিন্তু লক্ষনীয় হচ্ছে, দ্বীনের এই কথাটার উপর একজন অমুসলমান কী পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করেছে। একটু চিন্তা করে দেখা দরকার যে, আমাদের কোনো ব্যক্তি যখন কোনো যৌথ বস্তু ব্যবহার করে, তখন কি তার এ কথাটার খেয়াল হয়? বরং সে নোংরা ছেড়ে ফিরে আসে। আর বলে যে, যে পরে আসবে সেই ঠিক করে নেবে। যার দরকার, সেই বুঝবে, কী করবে, কীভাবে করবে।

অমুসলিম কেন উন্নতি করছে

ভালো করে বুঝে নিন, এই পৃথিবী আসবারের জগত। যদি উল্লিখিত গুণাবলি অমুসলিমরা হাসিল করে আমল করা শুরু করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ওদের উন্নতি দান করবেন। যদিও আখিরাতে ওদের কোনো অংশ থাকবে না। কিন্তু মুআশারাতের ঐসব আদব, যা নবীজি (সাঃ) আমাদের শিখিয়ে গেছেন, সেগুলো ওরা গ্রহণ করেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উন্নতি দান করেছেন।

এই অভিযোগ তো আমরা সহজেই করে রেখেছি যে, আমরা মুসলমান, কলেমা পড়েছি, ঈমান এনেছি, তা সত্ত্বেও দুনিয়াতে আমরা অপদস্ত হচ্ছি। আর ওরা অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও উন্নতি লাভ করছে। এটা কী করে সম্ভব?

কিন্তু এদিকে আমাদের নজর নেই যে, ঐ অমুসলিমদের অবস্থা হল, ওরা ব্যবসায় মিথ্যা বলে না- আমানতের সাথে কাজ করে। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা ওদের ব্যবসাকে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। আর মুসলমান ঐসব গুণাবলী ছেড়ে দিয়েছে এবং দ্বীনকে মসজিদ-মাদ্রাসার গণ্ডিতে এনে বসে গেছে। জীবনের অন্য বিষয়াদিগুলোকে দ্বীন থেকে বের করে দিয়েছে। এর ফলে নিজের দ্বীন থেকে নিজেও দূরে চলে গেছে। আর দুনিয়াতেও অপদস্ত হচ্ছে।

অথচ নবীজি (সাঃ) ঐসব শিক্ষা আমাদের দান করেছিলেন, যাতে সেগুলো আমরা আমাদের জীবনে ফিট করে নেই এবং আমাদের দ্বীনের অংশ বানাই।

যাই হোক, কথা শুরু হয়েছিল 'দুই খেজুর একত্রে খেও না' বাক্যটি থেকে। আর তা থেকে এমন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-নীতি উদ্‌ঘাটিত হলো। এখন বোঝা যাচ্ছে, এটি নবীজির কত বড় ও ব্যাপক ভাষ্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরের মধ্যে অনুভূতি ও উপলব্ধি জাগ্রত করুন। আমীন!

হেলান দিয়ে খাওয়া সুন্নতের খেলাফ

হযরত আবু হুজাইফা (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) বলেছেন, "আমি হেলান দিয়ে খাই না।" (বোখারী)

অপর এক হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, "আমি হুজুর (সাঃ)কে হাঁটু খাড়া করে বসে খেজুর খেতে দেখেছি।" (মুসলিম)

পায়ের পাতায় ভর করে বসে খাওয়া সুন্নত নয়

খাওয়ার বৈঠকের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। এগুলো দূর করা প্রয়োজন। নবীজি (সাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী খাওয়ার মুস্তাহাব ও সর্বোত্তম বৈঠক-পদ্ধতি হল, এমনভাবে বসা, যাতে খাবারের সম্মান রক্ষা পায় ও বিনয় প্রকাশ পায়। বসা অহংকারপূর্ণ না হয় এবং খাবারের প্রতি অসম্মান ও অবজ্ঞা প্রদর্শিত না হয়।

পায়ের পাতায় ভর করে বসে খাওয়া সম্পর্কে নবীজি (সাঃ)-এর যে বৈঠকের কথা প্রসিদ্ধ আছে, তা সঠিক নয়। আমি এরূপ কোনো হাদীস খুঁজে পাইনি। অবশ্য উপরে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি থেকে নবীজি (সাঃ)-এর যে বৈঠকের প্রমাণ পাওয়া যায়, তা এই যে, তিনি মাটির উপর বসেছেন ও হাঁটুযুগল সম্মুখে খাড়া রেখেছেন।

এতে পায়ের পাতায় ভর করে বসা প্রমাণিত হয় না; সুতরাং এটি সুন্নত নয়। অবশ্য এতটুকুর প্রমাণ আছে যে, খাওয়ার সময় নবীজি (সাঃ)-এর বৈঠক হতো বিনয়ের বৈঠক, যা দর্শকের চোখে ফেরাউনী কিংবা অহংকারপূর্ণ বৈঠকের অনুভূতি সৃষ্টি করত না; বরং দাসত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করত।

খাওয়ার সর্বোত্তম বৈঠক

জনৈক সাহাবী বলেন, আমি একবার নবীজি (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে দেখলাম, তিনি এমনভাবে খাচ্ছেন, যেভাবে কোনো দাস বা চাকর বসে খায়। যাই হোক, সমগ্র হাদীস ভাণ্ডার থেকে ওলামাগণ যা কিছু পেয়েছেন, তা এই যে, দোজানু বসে খাওয়া সর্বোত্তম; কেননা, তাতে সর্বাধিক বিনয় পাওয়া যায়।

তদুপরি খাবারের প্রতি শ্রদ্ধাও বেশি প্রদর্শিত হয়। আর তাতে অতি ভোজনের পথও বন্ধ হয়। কেননা, এতে চেপে বসা হয়। আর কেউ যদি নিজেকে খুব খুলে বসে, তাহলে তার অধিক ভোজনের অবকাশ অবারিত থাকে, যা ক্ষতিকর ও বর্জনীয়।

তাই আমাদের বুজুর্গগণ বলেন, এক হাঁটু উঁচিয়ে আর এক হাঁটু বিছিয়ে বসাও দোজানু বসার অনুরূপ- এটিও বিনয়াবনত বৈঠক। আর এভাবে বসার মধ্যে দুনিয়ারও উপকার আছে, আখিরাতেরও উপকার আছে।

চার জানু (আসন করে) বসেও খাওয়া জায়েয আছে

খাওয়ার সময় চার জানু হয়ে বসাও জায়েয আছে। কিন্তু এই বৈঠক বিনয়ের অত কাছাকাছি নয়, যত কাছাকাছি পূর্ববর্তী দু'বৈঠক। সুতরাং অভ্যাস করা উচিত দোজানু করে বসার কিংবা এক হাঁটু উঁচিয়ে ও অপরটি বিছিয়ে বসার। কিন্তু কেউ যদি তাতে অভ্যস্ত না হয় অথবা একটু আরাম করে বসার ইচ্ছায় যদি চার জানু হয়ে বসে, তাতেও কোনো দোষ নেই, গোনাহ নেই।

মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে যে, চার জানু বসে খাওয়া জায়েয নেই, এটা ভুল ধারণা। অবশ্য উত্তম হলো দোজানু হয়ে বসা। কেননা, এতে খাবারের মর্যাদা অধিক প্রকাশ পায়।

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়াও গোনাহ কিংবা নাজায়েয নয়। তবে মাটিতে বসে খাওয়া সুন্নতের অধিকতর নিকটবর্তী এবং তাতে সুন্নতের এত্তেবাও সর্বাধিক। সুতরাং যতদূর সম্ভব মাটিতে বসে খাওয়ার অভ্যাস করবে। কেননা, আমল সুন্নতের যত নিকটবর্তী হবে, বরকতও ততোধিক হবে। আর ততোধিক সওয়াবও হাসিল হবে, উপকারিতাও ততোধিক লাভ হবে। মোটকথা, চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়াও জায়েয আছে।

মাটিতে বসে খাওয়াই প্রকৃত সুন্নত

হুজুর (সাঃ) দুই কারণে মাটিতে বসে খেতেন। এক তো এই যে, তখনকার যুগের জীবনযাপন সহজ-সরল ও সাধারণ ছিল। চেয়ার-টেবিলের প্রচলনই ছিল না। এ কারণে নীচে বসতেন। দ্বিতীয় কারণ হল, নীচে বসে খাওয়ার মধ্যে বিনয় অধিক পাওয়া যায় এবং খাবারের সম্মানও অধিক হয়। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, মাটিতে বসে খাওয়ার মধ্যে মনের অবস্থা এক রকম থাকে, আর চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়ার মধ্যে মনের অবস্থা অন্য রকম থাকে। উভয়ের মাঝে আসমান-জমিনের ফারাক বিদ্যমান। কারণ, মাটিতে বসে খাওয়ার মধ্যে মনে বিনয়ের ভাব অধিক হয়; অসহায়ত্ব ও দাসত্বের ভাব ফুটে ওঠে। পক্ষান্তরে চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়ার মধ্যে এসব গুণ অনুপস্থিত। এ কারণেই সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে মাটিতে বসে খাওয়ার। কিন্তু যদি কখনো চেয়ার-টেবিলে

বসে খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে যায়, তাতেও কোনো অসুবিধা হবে না, গোনাহ হবে না। সুতরাং এ বিষয়ে এতেটা কঠোরতা প্রদর্শণ করা ঠিক নয়, যা অনেককে করতে দেখা যায় যে, চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়াকে হারাম ও নাজায়েয মনে করেন এবং এর উপর খুব বেশি নাক ছিটকান।

মাটিতে বসে খাওয়া সুন্নত হওয়ার জন্য একটি শর্ত

মাটিতে বসে খাওয়া সুন্নতের অধিকতর নিকটবর্তী এবং অধিক সওয়াব লাভের উপায় ও সর্বোত্তম। এটা তখন, যখন এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা না হয়। অর্থাৎ একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা হাসি-ঠাট্টা করা না হয়। সুতরাং যদি কোথাও এমন আশংকা দেখা দেয় যে, নীচে বসে খেলে লোকেরা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে, তখন নীচে বসে খাওয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করাও দুরস্ত হবে না।

আব্বাজান একবার ছবক পড়াবার সময় আমাদেরকে তার একটি ঘটনা এভাবে শুনিয়েছেন যে, একবার আমি ও আমার কতিপয় সঙ্গী-সাথী দেওবন্দ থেকে দিল্লি গিয়েছিলাম। দিল্লি পৌঁছলে খানা খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেহেতু খাওয়ার আর কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তাই আমরা সবাই একটি হোটেলে ঢুকে পড়লাম।

এ তো সবারই জানা যে, হোটেলে চেয়ার-টেবিলে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই কারণে আমাদের দু'জন সাথী বললেন, আমরা চেয়ার-টেবিলে বসে খাব না, কেননা, মাটিতে বসে খাওয়া সুন্নত। যাই হোক, তারা হোটেলের ভেতরেই মাটিতে রুমাল বিছিয়ে বয়দের মাধ্যমে খানা এনে খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আব্বাজান (রহঃ) বলেন, আমি তাদের নিষেধ করলাম; কিন্তু তারা বলল, চেয়ার-টেবিলে বসে আমরা কেন খাব, যেখানে মাটিতে বসে খাওয়া সুন্নতের অধিকতর নিকটবর্তী। সুতরাং ভয়ই বা কিসের, লজ্জাই বা কেন করব।

আব্বাজান বললেন, লজ্জা বা ভয়ের বিষয় নয়; বরং আসল কলা হলো, যখন তোমরা এভাবে নিজেদের রুমাল বিছিয়ে বসবে, তখন মানুষের সামনে তোমরা এই সুন্নতকে মজাকের বস্তুতে পরিণত করবে; এভাবে মানুষ এই সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা করার দায়ে পড়বে। আর সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন শুধু গোনাহই নয়; বরং কোনো কোনো সময়ে তা মানুষকে কুফ্‌রি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন!

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

হযরত আব্বাজান (রহঃ) বলেন, আমি তোমাদের একটি গল্প শুনাচ্ছি। অতীতে একজন অনেক বড় ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন, যার নাম সুলায়মান আ'মাশ; যিনি হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এরও ওস্তাদ ছিলেন। হাদীসের সব কিতাব তার বর্ণনা দ্বারা ভরপুর। আরবী ভাষায় আ'মাশ বলা হয় ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে।

যেহেতু তার চোখে দুর্বলতা ছিল, যার কারণে পলক পড়ে যেত ও আলোর ঝলকানিতে চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হয়ে যেত। তাই তিনি আ'মাশ উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

এই বুজুর্গের কাছে একজন ছাত্র এসেছিল। সে ছিল পঙ্গু। আর এই ছাত্রটিও এমন ছিল যে, সর্বদাই সে ওস্তাদের সঙ্গে থাকত। অনেক ছাত্রেরই এরূপ মানসিকতা থাকে। ওস্তাদ যেখানে যায়, ছাত্রও সাথে সাথে সেখানে যায়।

যাই হোক, ইমাম আ'মাশ যখন বাজারে যেতেন, তখন তার ঐ লেংড়া ছাত্রটিও সাথে যেত। লোকজন এই দৃশ্য দেখে প্রবাদ তৈরি করে ফেলল যে, দেখ ওস্তাদের চোখ নেই, আর ছাত্রের পা নেই।

একবার ইমাম আ'মাশ তার ঐ শাগরেদকে বললেন, তুমি আর আমার সঙ্গে বাজারে যেও না। শাগরেদ বলল, কেন, আমি আপনার সান্নিধ্য ও সঙ্গ ছেড়ে দেব? ওস্তাদ বললেন, মানুষ যে হাসি-ঠাট্টা করে বলে, 'ওস্তাদের চোখ নেই আর শাগরেদের পা নেই'।

শাগরেদ বলল, হযরত! ওরা যা বলে বলতে দিন, আমরা সওয়াব পেয়ে যাব; আর ওরা তো গোনাহগার হবে। এতে আমাদের ক্ষতি কী? হযরত আ'মাশ উত্তরে বললেন, "আমরাও গোনাহ থেকে বাঁচব, ওরাও গোনাহ থেকে বাঁচবে– এটা আমাদের বিনিময় লাভ ও তাদের গোনাহগার হওয়া থেকে অনেক ভালো।"

আমার সঙ্গে তোমার বাজারে যাওয়া তো কোনো ফরজ-ওয়াজিব নয়। আর না যাওয়াতে তোমার বা আমার কোনো ক্ষতিও তো নেই। তবে উপকার এই হবে যে, লোকেরা ঐ গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে।

এরা আমাদের মুসলমান ভাই। সুতরাং উত্তম হলো, না আমাদের কোনা গোনাহ হয়, না ওদের। সুতরাং আগামীকাল থেকে তুমি আর আমার সঙ্গে বাজারে যাবে না।

সব ক্ষেত্রে মজাকের পরওয়া করা যাবে না

বিশেষত কোনো গুনাহের কাজ হলে কারো পরওয়া করা যাবে না। চাই কেউ হাসি-ঠাট্টা করুক কিংবা বিরত থাকুক; এদিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না।

মানুষের ঠাট্টার কারণে কোনো গোনাহের কাজ করা যাবে না। আর কোনো ফরজ-ওয়াজিব মানুষের ঠাট্টার কারণে ছেড়ে দেয়া জায়েয নেই।

হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, একদিকে জায়েয ও মুবাহ কাজ আর অপরদিকে আওলা ও আফজাল কাজ। এমতাবস্থায় মানুষকে গোনাহ থেকে বাঁচাবার জন্য আফজাল কাজকে ছেড়ে দিয়ে জায়েয কাজকে গ্রহণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং এরূপ করাই যথার্থ।

বিনা প্রয়োজনে চেয়ার-টেবিলে খাবে না

একবার হযরত থানবী (রহঃ)-এর চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তিনি বললেন, এমনিতে চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া নাজায়েয নয়। তবে এতে কিছুটা বিজাতীয় সাদৃশ্য গ্রহণের 'আভাষ' রয়েছে। কেননা, পদ্ধতিটি ইংরেজদের দ্বারা প্রচলিত হয়েছে। না জানি খাওয়ার মধ্যে ওদের সাদৃশ্য দোষ সৃষ্টি হয়ে যায়।

তাই তিনি চেয়ারে বসার সময় পা তুলে বসলেন, পা ঝুলিয়ে দিলেন না। এরপর বললেন, ইংরেজদের তরিকার সাথে একাকার হয়ে খাওয়ার যে ভয় ছিল, তা এরূপ বসার দ্বারা খতম হয়ে গেল। কেননা, ওরা পা ঝুলিয়ে বসে আর আমি পা উঁচিয়ে বসে খাচ্ছি।

যাই হোক, চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া নাজায়েয নয়, গোনাহ নয়; তবে এতটুকু যে, মানুষ যতবেশি সুন্নতের নিকটবর্তী হবে ততবেশি বরকত ও সওয়াব লাভ করবে। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়ার অভ্যাস করে নেয়া ভালো নয়। উত্তম হলো, মাটিতে বসে খাওয়ার এহতেমাম করা। কিন্তু যেখানে প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এতটুকু খেয়াল রাখতে হবে, যেন পেছনে পিঠ চেয়ারের সাথে না লাগে; বরং সম্মুখের দিকে ঝুঁকে খানা খাবে। পেছনে ঠেস দিয়ে খাওয়াকে নবীজি (সাঃ) অহংকারপূর্ণ খাওয়া সাব্যস্ত করেছেন। এটি অহংকারীদের আমল, এটি দুরস্ত নেই।

চৌকিতে বসে আহার করা

চৌকিতে বসে আহার করাও বৈধ; বরং চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়ার তুলনায় চৌকিতে বসে খাওয়া উত্তম। কেননা, ঐ তরিকা, যেখানে আহারকারী ও আহার্য বস্তু একই সমতলে থাকে, তা উত্তম ঐ তরিকার চেয়ে, যেখানে আহারকারী নীচে আর আহার্য বস্তু উপরে থাকে। সর্বোত্তম তো হলো মাটিতে বসেই খাওয়া। এতে সওয়াবও বেশি বিনয়ের গুণও বেশি। সর্বোপরি তা সুন্নতের সর্বাধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুন্নতের ওপর আমল করার ও তার কাছাকাছি অবস্থান করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

খাওয়ার সময় কথা বলা

একটা ভুল কথা চালু হয়ে গেছে যে, আহার করার সময় কথা বলা জায়েয নেই। এটিও ভিত্তিহীন। শরিয়তে এর কোনো প্রমাণ নেই। আহার করার সময় প্রয়োজনীয় কথা বলা যায়। নবীজি (সাঃ) থেকে এর প্রমাণও আছে। অবশ্য হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন, আহারের মাঝে কোনো গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা না হওয়া চাই। সাধারণ কথা হলে ক্ষতি নেই। কেননা, খাবারেরও হক আছে।

আর তাহল, মনোযোগ সহকারে খাওয়া। গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ কথা শুরু হলে খাবারের পরিবর্তে কথার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে; আর তাতে খাবারের হক নষ্ট হবে; সুতরাং তা দুরস্ত নেই। কিছুটা আনন্দদায়ক ও সামান্য বিনোদনমূলক দু'চারটা কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু যে কথাটা প্রসিদ্ধ আছে যে, খাওয়ার সময় বিলকুল কথা বলা যাবে না, সম্পূর্ণ নীরব ও নিশ্চুপ থাকতে হবে, এটা ঠিক নয়।

আহারের পর হাত মুছে নেয়া

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণণা করেন, হুজুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের কেউ আহার সমাপ্ত করে, তখন সে যেন হাত পরিষ্কার না করে তা চেটে খাওয়ার পূর্বে কিংবা অন্য কাউকে চাটাবার পূর্বে।"

ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ হাদীস থেকে দু'টি মাসআলা বের হয় এবং দু'টি আদব পাওয়া যায়। প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে, খাওয়ার পর যেভাবে

হাত ধোয়া জায়েয এবং মুস্তাহাব ও সুন্নত, অনুরূপভাবে হাত কোনো কিছুর দ্বারা মুছে নেয়াও জায়েয। অবশ্য উত্তম হলো হাত পানি দ্বারা ধুয়ে নেবে। কিন্তু যদি পানি না থাকে, তাহলে কাপড় দ্বারা মুছে নেয়াও জায়েয। আজকাল টিস্যু পেপার এই উদ্দেশ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো দ্বারা হাত মুছে নেয়া জায়েয।

আহারের পর আঙ্গুল চেটে খাওয়া সুন্নত

দ্বিতীয় মাসআলা- যা এই হাদীসের মর্ম- এই যে, হাত ধোয়ার কিংবা মোছার পূর্বে তা চেটে খাবে। খোদ নবীজি (সাঃ)-এর এরূপ অভ্যাস ছিল। নবীজি (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল যে, খাবার যা কিছু হাতে লেগে থাকত, তা তিনি চেটে নিতেন।

এর তাৎপর্য নবীজি (সাঃ) নিজে অপর এক হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন, তোমার জানা নেই যে, খাবারের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে খাবারের ঐ বিশেষ অংশে এমন কোনো বরকতের দিক থাকতে পারে, যা অন্য কোনো অংশ নেই। সম্ভবত বরকত ঠিক ঐ অংশেই রয়ে গেছে, যা তোমাদের আঙুলে লেগে আছে। সুতরাং এই অংশটুকুকেও নষ্ট করে দিও না; বরং তাও খেয়ে নাও, যাতে বরকত থেকে বঞ্চিত না হও।

বরকত কী

এখন প্রশ্ন, বরকত কী জিনিস? আজকের এই পৃথিবী, যা বস্তুর মধ্যে ডুবে আছে, সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত শুধু বস্তুর চক্করই নজরে পড়ে এবং বস্তু ও আসবাব-পত্রোর পেছনে ধন-দৌলত এবং সমগ্র যোগ্যতাই নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

যার ফলে আজ আর বরকতের অর্থ উপলব্ধি হচ্ছে না এবং বুঝা যাচ্ছে না যে, এই বরকত এমন এক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ ও সফলতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি মূলত আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ দান, যা অনেকেই তার জীবনের একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছেন। বরকতের স্বরূপ এভাবে কিছুটা অনুধাবন করা যায় যে, মানুষ কখনও একটা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য একাধিক ও অগণিত উপকরণ একত্র করে ফেলে, কিন্ত তাতে উপকার কিছুই হয় না।

উদাহারণত ঘরে আরাম-আয়েশের সকল আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হলো। উন্নত থেকে উন্নততর ফর্নিচার দ্বারা ঘরকে সুসজ্জিত করা হলো। উৎকৃষ্ট ধরনের বিছানা পাতা হলো। চাকর-নকরও সব একত্রিত হলো। সাজগোজের পর সকল সামগ্রী সংগৃহীত হলো। এরপরও রাতে ঘুম হলো না। সারা রাত বিছানায় শুধু পার্শ্ব বদলাতে বদলাতে কেটে গেল। (কোন সুখ হলো না) সুতরাং বোঝা গেল, আসবাবপত্রের মধ্যে সুখ নেই। তদুপরি এই সব বস্তু-সামগ্রী থেকে যে উপকার লাভ করার কথা ছিল, তা হয়নি।

এখন চিন্তা করে দেখা দরকার যে, এইসব বস্তু-সামগ্রী তাহলে কী শুধু একমাত্র লক্ষ ছিল জীবনে যে, এগুলো দ্বারা ঘর সাজিয়ে এখন তা দেখতে থাকবে ও খুশি হতে থাকবে? আসলে তো এগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সুখ-শান্তি লাভ করা। কিন্ত তা হয়নি।

মনে রাখা দরকার যে, এই সব বস্তু-সামগ্রী আরাম-আয়েশের উপকরণ তো বটে; কিন্তু যে জিনিসটার নাম সুখ ও শান্তি, সেটা আগা-গোড়াই মহান আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ দান; তিনি যখন তা দান করেন, শুধু তখনই তা পাওয়া যাবে, নতুবা এই পৃথিবীর যত বস্তু-সামগ্রীই সংগৃহীত হোক না কেন, সুখ-শান্তি তাতে কখনোই হবে না। এতেই অনুমিত হবে যে, এক্ষেত্রে বরকত অনুপস্থিত।

উপকরণের নাম সুখ-শান্তি নয়

প্রত্যেকে আজ নিজ নিজ অবস্থার দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তা করে দেখি, এখন থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে প্রত্যেকের কাছে কী পরিমাণ মাল-সামান ছিল। আর বর্তমানে কী পরিমাণ আছে। খোঁজ-খবর নিলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় চাঙ্গা হয়েছে। আসবাবপত্র বৃদ্ধি পেয়েছে, ফার্নিচার পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে। বাড়ি-ঘর পূর্বের তুলনায় আধুনিক হয়েছে। আরামদায়ক বস্তু পূর্বের তুলনায় অধিক হয়েছে। কিন্তু দেখা দরকার যে, মনের শান্তি কি পূর্বের তুলনায় অধিক অর্জিত হয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে অর্থ এই হবে যে, এইসব মাল-সামান দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত হাসিল হয়নি।

আমরা যে বলে থাকি, জিনিসে বরকত আছে, এর অর্থ হলো, ঐ বস্তু দ্বারা যে উপকার লাভ করার কথা ছিল, তা হচ্ছে। আর বে-বরকতি হল, ঐসব বস্তর ব্যবহার করার পরও শান্তি লাভ হচ্ছে না।

সুখ সরাসরি আল্লাহর দান

স্মরণ রাখা উচিৎ, সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ পয়সার বিনিময়ে বাজার থেকে ক্রয় করা যায় না। এ হচ্ছে সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার দান, তিনিই শুধু তা দান করে থাকেন। এরই নাম বরকত। যাদের অর্থে বরকত আছে, গণনার দিক থেকে হয়ত তা অনেকের তুলনায় কম হবে; কিন্ত এই অর্থের বিনিময়ে যে সুখ লাভ উদ্দেশ্য ছিল, তা তাদের হাসিল হচ্ছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন বিত্তশালী ব্যক্তি, যার কাছে পৃথিবীর সকল বস্তু-সামগ্রী প্রাচুর্য রয়েছে। মিল আছে, গাড়ী আছে, ফার্নিচার আছে, চাকর-নকর আছে, খাবারের সময় এলে দস্তরখানে উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর খাবারের সমারোহ হচ্ছে; কিন্তু লোকটার পাকস্থলী নষ্ট-ক্ষুধা হয় না। ডাক্তার বলেছেন, অমুকটা খাবেন না, অমুকটা পান করবেন না। সব কিছু থাকা সত্ত্বেও সব বেকার। এরই নাম বে-বরকত।

অপর দিকে একজন দিনমজুর আট ঘণ্টা শ্রম ব্যয় করে একশত টাকা উপার্জন করেছে, এরপর হোটেল থেকে ডাল-ভাত বা ভাত-ভাজি ক্রয় করে পরিপূর্ণ ক্ষুধার মুহূর্তে একেবারে পেটপূর্ণ করে খুব মজা করে খেয়েছে এবং পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও পরিতুষ্টি লাভ করেছে। অতঃপর যখন রাতে নিজের ভাঙা চৌকির ওপর শুয়েছে, তখন সারাদিনের শ্রম ব্যয়ের মূল্য একশত ভাগ উসুল করে ঘুম থেকে উঠেছে।

এতে বুঝা গেল, ঐ শ্রমিক আহারের স্বাদও লাভ করেছে, নিদ্রার আনন্দও পূর্ণমাত্রায় পেয়েছে। শুধু এতটুকুই ফারাক যে, সম্পদশালী ব্যক্তির মতো বড়লোকি অবস্থাটা তার নেই। কিন্তু লোকটার জীবনে বরকত বুঝা যাচ্ছে, যা আল্লাহ তা'আলা অল্প উপকরণের মধ্যে দান করেছেন এবং যে বস্তুর দ্বারা তার যে উপকার লাভ করার কথা ছিল, সে তা পূর্ণমাত্রায় অর্জন করতে পেরেছে।

খাদ্যে বরকতের অর্থ

ভেবে দেখুন, যে খাবার আপনি খাচ্ছেন, ঐ খাবার আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। বরং আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ খাবারের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করা, শরীর শক্ত হওয়া। আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষুধা নিবারণ হওয়া এবং ঐ খাবারটা শরীরের অংশে পরিণত হওয়া ও তা দ্বারা স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ করা। কিন্তু খাদ্যের মাধ্যমে এই সব কিছু লাভ হওয়া শুধু আল্লাহ

ত'আলার ইচ্ছার উপরই নির্ভশীল। এই কথাটাই নবীজি (সাঃ) নিম্নোক্ত হাদীসটির মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

"তোমার কি জানা আছে যে, খাবারের কোন্ অংশে বরকত রাখা আছে? এমনও তো হতে পারে, যে খাবর তুমি খেয়ে শেষ করেছ, বরকত তাতে নেই। আর যা তোমার আঙ্গুলে লেগে আছে, তাতেই সব বরকত লুকায়িত আছে; আর তুমি তা খাওনি? ফলে তুমি বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছো।"

যাই হোক, আপনি খেয়েছিলেন ঐ খাবার যাতে বরকত ছিল না, ফলে তা শরীরের অংশে পরিণত হতে পারেনি। বরং ঐ খাবার বদ-হজম সৃষ্টি করেছে এবং আপনার স্বাস্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আর তাতে যে শক্তি অর্জিত হবার কথা ছিলা, তাও হাসিল হয়নি।

আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে খাবারের প্রভাব

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি বাহ্যিক অবস্থার উপর বলছিলাম। নতুবা আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন, তারা আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলেন, খাদ্যে খাদ্যে ব্যবধান আছে। কোন কোন খাবার মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান–ধারণার উপর প্রভাব ফেলে। কোন কোন খাবার মানুষের ভিতরে অন্ধকার সৃষ্টি করে, যার ফলে অন্তরে কু-ইচ্ছা ও কু-ধারণা পয়দা হয়। গোনাহ্ করার আগ্রহ ও মন্দ কর্মের উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

আবার কিছু খাবার এতই বরকতময় যে, তার মাধ্যমে ভেতরে প্রফুল্লতা আসে, আত্মার খোরাক হয়, ভালো ইচ্ছা ও ভালো ধ্যান-ধারণা জন্ম নেয়; যার উসিলায় মানুষের মনে সৎকর্মের প্রতি স্পৃহা ও উৎসাহ্ জাগ্রত হয়।

কিন্ত যেহেতু আমাদের চক্ষু আজকের এই বস্তুপূজার যুগে এসে অন্ধ হয়ে গেছে, আমরা অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে বসেছি, ফলে খাবারের মধ্যে অন্ধকার ও আলোর ফারাক অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। বুঝবার জন্য আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে শুভ অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।"

খাদ্যের প্রভাব সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা

হযরত থানবী (রঃ)-এর ওস্তাদ দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রঃ)-এরই ঘটনা হবে সম্ভবত। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে দাওয়াত করল। তিনি সেখানে গেলেন। আহারপর্ব শুরু হলো। এক লোকমা খাওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন

যে, দাওয়াতকারীর উপার্জন হালাল নয়। সুতরাং এই খাবারও হালাল নয়। তিনি খানা রেখে চলে এলেন। কিন্তু তিনি যে লোকমাটা গিলে ফেলেছিলেন, সে সম্পর্কে বলতেন, দু'মাস পর্যন্ত ঐ লোকমাটার অন্ধকার আমি অনুভব করেছি। আর তা এভাবে যে, এই দু'মাসের মধ্যে আমার মনে গোনাহ করার প্রেরণা বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বারবার মনে উদিত হয়েছে, অমুক গোনাহ্র কাজটা করে ফেলি ইত্যাদি।

বাহ্যত এক লোকমা হারাম খাবার আর গোনাহ্ করার প্রেরণার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সত্য এই যে, আমাদের অন্তর গোনাহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ফলে আমাদের প্রকৃত অবস্থা অনুভব হয় না। আমাদের কাছে গোনাহ্ ও হারাম খাবার একাকার হয়ে আছে, অনুভব হবে কিভাবে?

উদাহারণত, একটি সাদা কাপড়ের উপর অগণিত কালো দাগ পড়ে আছে। এরপর তাতে আরো একটি দাগ লাগল, এখন অনুমান করাই সম্ভব হবে না যে, নতুন দাগ কোন্টি। কিন্ত কাপড়টার যদি সাদা পরিষ্কার হয় আর তার ওপর যদি একটা সামান্য দাগও লেগে যায়. তাহলে বহুদূর থেকেই সেটা অনুমিত হবে যে, কাপড়ে দাগ লেগেছে। ঠিক এমনই ঐসব আল্লাহ-পাগলদের অন্তর, যা একেবারে আয়নার মতো স্বচচ্ছ ও পরিষ্কার। তাতে যদি কখনো একটি মাত্র দাগও লেগে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তা অনুভূত হয়ে যায়।

তাই তো আল্লাহর বান্দা অনুভব করলেন যে, দাওয়াতের ঐ একটি মাত্র লোকমা খাওয়ার পূর্বে তো নেক কাজের প্রতি মনে-প্রাণে প্রচূর আগ্রহ-উদ্দীপনা বিরাজমান ছিল, গোনাহের প্রতি ঘৃণা হতো।

অথচ তারপর থেকেই গোনাহ করার উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই তিনি বলতেন, নিঃসন্দেহে এটি ঐ অশুভ লোকমাটারই অন্ধকার প্রভাব ছিল। এরই নাম বরকতে বাতেনি বা আভ্যন্তরীণ বরকত। যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে এই রবকত প্রদান করেন, তখন তা মানুষের অভ্যন্তরে উন্নতি লাভ করে। আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণা সঠিক গতি পায়।

আমরা বস্তুপূজায় আটকে পড়েছি

আমরা আজ বস্তু ও অর্থ পূজায় আটকে পড়েছি। আসবাবপত্র ও সাজ-গোজে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। যার ফলে প্রত্যেক কাজে আত্মা ও প্রাণ আমাদের দৃষ্টি থেকে সরে গেছে। এখন এটি আমাদের কাছে অবাস্তব মনে

হয়। এর কারণেই বরকতের অর্থও আমাদের বোধগম্য হয় না। কেউ যদি এক হাজার বার বলে যে, অমুক কাজে বরকত আছে, তবুও আমাদের মনে তার কোনো গুরুত্ব উপলব্ধি হয় না।

কিন্তু কেউ যদি বলে, এই খাবারটা খাও এক হাজার টাকা পাবে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মনে আগ্রহে সৃষ্টি হয়। আর মনে মনে এ কাজের প্রতি আস্থা হয় যে, এত দিনে একটা কাজের কথা শোনা গেল। আর যদি কেউ বলে, অমুক নিয়মে খাওয়া-দাওয়া করলে বরকত হয়, তাহলে তার এর প্রতি কোন আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। কেননা, তার জানা-ই নেই যে, বরকত কী? বরকতের কোনো কল্পনাই সমাজে নেই। অথচা নবীজি (সাঃ) বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, অমুক কাজে বরকত হয়, অমুক কাজে বরকত নষ্ট হয়। বরকত হাসিল করার চেষ্টা করো, বে-বরকত থেকে বাঁচো।

এর কারণ ঐ একটিই, অর্থাৎ আমাদের মন ও মগজকে বস্তু ও পার্থিব চাকচিক্য আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই স্মরণ রাখতে হবে যে, বস্তুর প্রভাবমুক্ত হয়ে শুধু মাত্র সুন্নতের অনুসরণে নিমগ্ন হতে হবে। তবেই বরকত পাওয়া যাবে। নতুবা তা অবস্তব।

উল্লিখিত হাদীসে নবীজি (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "আঙুল চেটে খাও। কেননা, হতে পারে, খাবারের যে অংশবিশেষ তাতে লেগে আছে, বরকত তারই মধ্যে সুপ্ত আছে।"

এটি নবীজি (স)-এর সুন্নত, এর মধ্যেই বরকত।

আঙ্গুল চেটে খাওয়া কি ভদ্রতার খেলাফ

এখন তো ফ্যাশন-পুজার যুগ। লোকেরা নিজেদের জন্য নতুন নতুন ভদ্রতা ও সামাজিকতা তৈরী করে নিয়েছে। ফলে দস্তরখানায় সবার সাথে খেতে বসে আঙ্গুলে লেগে থাকা সালুনের অংশবিশেষ চেটে খেলে অভদ্রতা ভাবে। লজ্জা হয় যদি সবার সামনে এরূপ করি, তাহলে তো লোকেরা হাসবে এবং বলবে, লোকটা তো একেবারেই অভদ্র ও অমার্জিত।

ভদ্রতা ও সৌন্দর্য সুন্নতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

স্মরণ রাখা উচিত, যাবতীয় ভদ্রতা ও সভ্যতার চাবিকাঠি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ ও সুন্নত। তিনি যেটাকে ভদ্রতা বলেছেন, সেটাই ভদ্রতা। এমন নয় যে, ফ্যাশনবাজরা যেটাকে শালীনতা বলছে, সেটাই

শালীনতা ও ভদ্রতা। কারণ, ওদের ফ্যাশনবাজি তো দিন দিন বদলায়। এতকাল পর্যন্ত যেটা অমার্জিত ছিল, আজ হঠাৎ করে তা মার্জিত সাব্যস্ত হয়ে গেল। ভিত্তিহীন এসব সভ্যতা অসভ্যতারই নামান্তর।

দাঁড়িয়ে খাওয় মারাত্মক অসভ্যতা

উদাহরণত দাঁড়িয়ে খাওয়া আজকাল ফ্যাশন হয়ে গেছে। এক হাতে প্লেট আর অপর হাতে চামচ। একই প্লেটে ভাত, রুটি তরকারী, সালাদ ইত্যাদি সবকিছু। আর ভোজ অনুষ্ঠানে খাওয়া শুরু হলে ছিটাছিটি শুরু হয়। তখন কারো চোখে অভদ্রতা ধরা পড়ে না। বস্তুত ফ্যাশন-পূজা ওদের চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে। যার ফলে নিজেদের ভেতরকার অসভ্যতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

তাইতে দেখা যায়, যতদিন দাঁড়িয়ে খাওয়ার প্রচলন ঘটেনি, ততদিন কেউ যদি মজলিসে দাঁড়িয়ে খেত, তাহলে সে চরম অভদ্র সাব্যস্ত হতো ও সকলেই বলত, এ বড় উদ্ভট ও অভদ্র তরিকা। সঠিক নিয়মতো হলো, বসে আরামের সাথে খাওয়া।

ফ্যাশন কোন কিছুর ভিত্তি হতে পারে না

সুতরাং দেখা যায়, ফ্যাশনভিত্তিক ভদ্রতা ও সামাজিকতা রোজ-রোজই বদলায়। আর অস্থির ও অস্থিতিশীল কোনো কিছুরই কোনোরূপ গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। গ্রহণযোগ্যতা শুধু ঐ জিনিসের আছে, যাকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন এবং যার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ওতে বরকত আছে।

সুতরাং এখন যদি কেউ নবীজির সুন্নত মনে করে এই কাজ আঞ্জাম দেয় অর্থাৎ হাত চেটে খাওয়া), তাহলে আখেরাতেও বিনিময় ও সাওয়াব পাবে আর দুনিয়াতেও বরকত হাসিল হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি অসভ্যতা মনে করে তা ছেড়ে দেয়, তাহলে সে এর বরকতসমূহ হতে বঞ্চিত হবে, গোনাহের প্রতি তার আসক্তি বাড়বে। দিন-রাত দিল-দেমাগে অন্ধকার ও অজ্ঞানতা জেঁকে বসতে থাকবে।

যাই হোক, কথা দীর্ঘ হয়ে গেলো। মূল হাদীস শরীফে নবীজি (সাঃ)-এ কথার তাগিদ করেছিলেন যে, খাওয়ার শেষে আঙ্গুল চেটে খাবে, যাতে খাওয়ার বরকত অর্জিত হয়।

তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া সুন্নত

নবীজি (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল তিন আঙ্গুল দিয়ে খাবার গ্রহণ করা। অর্থাৎ- বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা- এই তিনটি অঙ্গুলীযোগে তিনি লোকমা তুলে নিতেন।

উলামায়ে কেরাম এই তিনটি অঙ্গুলী দিয়ে লোকমা তুলে নেয়ার একটি তাৎপর্য এই বর্ণনা করেছেন যে, নবীজির যুগ ছিল সহজ-সরল যুগ। আজকালকার মতো অতিরিক্ত ও বিলাসী খাবার ছিল না সে সময়। ফলে তিন আঙ্গুলই যথেষ্ট হতো।

দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, যখন আপনি আঙ্গুল দ্বারা লোকমা নেবেন, তখন তা এমনিতেই ছোট হয়ে যাবে।

চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে, লোকমা যতো ছোট হবে, হজমে ততো সুবিধা হবে। কেননা, বড় বড় লোকমা দাঁতে পূর্ণরূপে পিষবে না, ফলে তা পাকস্থলিতে গিয়ে হজমের ব্যাঘাত ঘটাবে।

ছোট লোকমার আরেকটি উপকারিতা হলো, তাতে ভদ্রতাও প্রকাশ পায়। বড় লোকমায় লোভ ও অভদ্রতা প্রকাশ পায়। এ কারণেই নবীজি (সাঃ) তিন আঙ্গুলযোগে [illegible]। সর্বোপরি এতে অল্প ভোজনের অনুশীলন হয়।

স্মরণীয় যে, নবীজি (সাঃ) কখনও কখনও চার আঙ্গুল দিয়েও খেয়েছেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি পাঁচ আঙ্গুল দিয়েও খেয়েছেন। এতে প্রয়োজনে চার বা পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার বৈধতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। তিন আঙ্গুলযোগে খাওয়াই নবীজির (সাঃ)-এর স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল। (মুসলিম)

আঙ্গুল চেটে খাওয়ার তারতীব

সাহাবীদের নবীপ্রেমের নিদর্শন দেখুন। তারা আমাদের জন্য নবীজি (সাঃ)-এর একেকটি আমলকে এমনভাবে সংরক্ষণ করে গেছেন, যাতে আমাদের জন্য তার অনুসরণ-অনুরকণ সহজ হয়ে যায়।

তাই তো দেখা যায় যে, তাঁরা আমাদের সম্মুখে নবীজি (সাঃ)-এর ঐ তিন আঙ্গুল চেটে খাওয়ার ধারাবাহিকতা পর্যন্ত বলে দিচ্ছেন। তাঁরা বলতেন, [নবীজি (সাঃ)] প্রথমে মধ্যমা, অতঃপর তর্জনী এবং সর্বশেষে বৃদ্ধাঙ্গুলী চেটে খেতেন।

সাহাবায়ে কেরাম যখন পরস্পর বসতেন, তখন তারা নবীজির (সাঃ)-এর সুন্নতের পর্যালোচনা করতেন আর একে অপরকে উৎসাহ দিতেন যে, আমাদের সবারই সুন্নতের অনুসরণ করা উচিৎ। লক্ষণীয় যে, কেউ যদি আঙ্গুল চেটে না খায়, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না। তবে সুন্নতের বরখেলাফ হওয়ার কারণে বরকত থেকে বঞ্চিত অবশ্যই হবে।

আর কতকাল হাসি-মজাকের পরোয়া করবে

আমরা যদি সবার সামনে হাত চেটে খাই, তাহলে তারা হাসবে, ঠাট্টা করবে আর আমাদেরকে অভদ্র ও অমার্জিত বলবে। কিন্তু যদি আমরা অতি দৃঢ়তার সাথে এই সিদ্ধান্তে উপনীদ না হই যে, দুনিয়ার মানুষ যা বলতে চায় বলুক, আমাদের কাছে নবীজির (সাঃ) সুন্নতই সবচেয়ে বেশি প্রিয়; আমাদের এরই ওপর আমল করতে হবে, তাহলে স্মরণ রাখুন, এই দুনিয়া আমাদের সঙ্গে হাসি-মজাক করতেই থাকবে।

পশ্চিমাদের অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের অবস্থা এখন এই দাঁড়িয়েছে যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিজেদের সবকিছু আজ ওদের রঙে রঙিন হয়ে গেছে, ওদের ছাঁচে শোভা পাচ্ছে। পোশাক-পরিচ্ছদ ওদের মতো। এভাবে সবকিছুতেই ওদের অনুসরণ করা আমাদের এতদিন একরূপ শেষ হয়েছে। এখন বলুন দেখি, ওদের কাছে আমাদের কোনো মান তৈরি হয়েছে কি? কিংবা আগামীতে হবে কখনো?

ওরা এখনো আমাদেরকে ছোট নজরেই দেখে। আমাদেরকে ওরা অপদস্ত মনে করে প্রতিদিনই আমাদের প্রহার করছে, আমাদের উপর চপেটাঘাত চলছে। আমাদের তুচ্ছ ও নীচ মনে করা হচ্ছে।

আর এর কারণ একটাই। তা হচ্ছে, ওদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা আমাদের প্রিয় নবীজি (সাঃ)-এর পবিত্র সুন্নত পরিত্যাগ করে ওদের আদর্শ অবলম্বন করে আছি। এখন ওরা ভালো করে জানে যে, এরা তো আমাদের মুকাল্লিদ—অনুসারী।

সুতরাং আমরা যতই ওদের বেশ-ভুষায় আচ্ছাদিত হই না কেন, কোনো লাভ নেই। আমরা ওদের দৃষ্টিতে সেকেলে, গোঁড়া ইত্যাদি থেকেই যাব। আর আমাদের উপর অভিযোগই চলতে থাকবে যে, আমরা অভদ্র, অমার্জিত।

এসব তিরস্কার নবীগণের উত্তরাধিকার

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একবার দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এই সিদ্ধান্ত না নেব যে, ওরা তিরস্কার করে করুক, ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা ঐরূপ করতেই থাকবে। কেননা, এই সব কটুবাক্য সত্যের পথে বিচরণকারীগণের ভূষণ। মানুষ যখনই হকের পথে পা রাখে, তখনই তাকে ঐসব গাল-মন্দ শুনতে হয়। আমরা আর কী? আমাদের নবীগণকেও এইসবের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

কোরআনের ভাষায় "কাফেররা নবীগণকে বলত, আমরা তো দেখতি পাচ্ছি যে, যারা তোমার পিছনে চলছে, তারা খুবই নিচু শ্রেণীর লোক; তুচ্ছ, অমার্জিত ও অভদ্র প্রকৃতির মানুষ।" (সূরা হুদ)।

যাই হোক, আমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকি, নবীগণের উম্মত ও তাদের অনুসারী হয়ে থাকি, তাহলে আমরা তাদের থেকে যা কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, তন্মধ্যে এইসব অকথ্য বাক্যসম্ভারও একই সূত্রে আমরাদেরই পাওনা সাব্যস্ত হয়ে আছে। আমাদের বরং ঐসব তিরস্কার ও ভর্ৎসনাগুলোকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে এবং গৌরবের বিষয় মনে করতে হবে।

মনে করতে হবে যে, আল্‌হামদুল্লিাহ, ঐ সবকিছুই আমাদেরও দেয়া হচ্ছে, যা ইতিপূর্বে নবীগণকে দেয়া হয়েছিল। স্মরণ রাখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই বোধ ও প্রেরণা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এইসব জাতিবর্গ আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেই থাকবে।

মরহুম আসাদ মুলতানী একজন বড় মাপের কবি ছিলেন। তিনি বড় উত্তম কবিতা লিখেছেন, যার অর্থ–

"হাসি মজাককে যতদিন আপনি ভয় করতে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত জামানা আপনাকে নিয়ে হাসতেই থাকবে।"

জামানা তো হাসি-তামাশা করে যাচ্ছে। তাই আল্লাহর ওয়াস্তে দিল থেকে এই আশঙ্কা বের করে দিতে হবে যে, দুনিয়া কী বলবে। বরং বলতে হবে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নতের উপর আমল করে দেখি, ইনশাআল্লাহ দুনিয়া সম্মান করতে বাধ্য হবে।

সবশেষে সম্মান মুসলমানেরই হবে। কেননা, সম্মান শুধু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য কারো অনুসরণে কোনো সম্মান নেই।

সুন্নতের অনুসরণের জন্য বিরাট সুসংবাদ

সুন্নতের অনুসরণের ওপর আল্লাহ্ তা'আলা এত বড় সুসংবাদ দান করেছেন, যার উপর আর কোনো সুসংবাদ হতে পারে না। কোরআনের ভাষায়–

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা থাকে, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন।"

এই আয়াতের অর্থ এই যে, হে আমার বান্দা সকল! তোমরা আল্লাহকে আর কী ভালোবাসবে, তোমাদের হাকীকতই বা কী? আর তোমাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু যে, তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে। হ্যাঁ, তোমরা যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণ-অনুরকণ করো, তাহলে খোদ আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন।

আমাদের হযরত (ডাঃ সাহেব) বলতেন, মানুষ যখন নবীজি (সাঃ)-এর অনুসরণ হিসেবে কোন আমল শুরু করে, যতক্ষণ সে তা করতে থাকবে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় থাকবে।

উদাহরণ স্বরূপ, শৌচাগারে প্রবেশ করার সুন্নত হলো, প্রথমে (ঢোকার পূর্বে) দু'আ পড়তে হবে। প্রবেশকালে প্রথমে বাঁ পা ভেতরে দেবে। যখন কেউ এই নিয়তে বাঁ পা ভেতরে রাখবে যে, এটি নবীজির (সাঃ)-এর সুন্নত, তখন সে ঐ মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় সাব্যস্ত থাকবে। কেননা, সে তখন মূলত আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় ব্যক্তির সুন্নতের অনুসরণ করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে প্রিয় বানাবেন

অনুরূপভাবে, যখন কেউ এই নিয়তে আঙ্গুল চেটে খাবে যে, এটি নবীজির সুন্নত; ঠিক ঐ মুহূর্তে সে আল্লাহ্‌র প্রিয় সাব্যস্ত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসতে থাকবেন।

হায়! আমরা কেন মাখলুকের দিকে হাঁ করে আছি যে, সে আমাকে ভালবাসছে কিনা, পছন্দ করছে কিনা? অথচ এই মাখলুকের খালেক ও মালেক খোদ তাকে ভালবাসেন। তার কাজকে পছন্দ করে বলেছেন যে, এই কাজ বড় উত্তম। এরপরও কি আর কারো পরোয়া থাকতে পারে যে, সে পছন্দ করেছে কিনা।

এ কারণেই যাবতীয় সুন্নতকে নিজের জীবনে কার্যকর করবে, সেগুলো

যত্নের সাথে পালন করবে। যদি পূর্ব থেকে এসব সুন্নতের উপর আমলের অভ্যাস না থাকে, তাহলে এখন থেকেই শুরু করে দেবে।

অনেকে বলে যে, আজকাল এমন এক যুগ এসে গেছে যে, সুন্নতের ওপর আমল করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমি বলি, আমরাই মানসিকভাবে এগুলোকে কঠিন করে রেখেছি। নতুবা বলুন দেখি, এই আঙ্গুল চেটে খাওয়াটা এমন কি কঠিন কাজ? কে কার হাত ধরে রেখেছে? এই সুন্নতের উপর আমল করায় কারো জীবন-সম্পদ এবং সুখ-শান্তির মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

একটি মাত্র সুন্নতের উপর আমল করার দ্বারাই যখন আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তা লাভ হচ্ছে এবং সুন্নতের বরকতও হাসিল হচ্ছে; সুতরাং হতে পারে এই একটি মাত্র সুন্নতের ওসিলায়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাও করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুন্নতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আলোচ্য হাদীস শরীফের মধ্যে একটা সুবিধা এই দেয়া হয়েছে যে, যদি আঙ্গুল নিজে না চাটে, তাহলে অপর কাউকে চাটাতে পারবে। হাদীসের ভাষ্য ঃ "অথবা অপরকে আঙ্গুল চাটাবে।"

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এর উদ্দেশ্য এই যে, অনেক সময় এমন হয় যে, আহারকারী নিজে চাটতে সক্ষম হয় না। এমতাবস্থায় অপরকে চাটাতে সুযোগ দেবে। যেমন– কোনো শিশুকে চাটাতে দেবে অথবা বিড়ালকে চাটাবে কিংবা কোনো পাখিকে দিয়ে চাটাবে। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা রিজিক নষ্ট হতে দেবেন না। কিন্তু কেউ যদি তা ধুয়ে ফেলে, তাহলে আল্লাহর তা'আলার রিজিক নষ্ট হলো। আর মাখলুককে চাটাতে দিলে সে তাতে বরকত লাভ করল।

আহারের পর বরতন চেটে খাওয়া

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হুজুর (সা) আঙ্গুল ও বরতন চেটে খেতে হুকুম করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা জানো না যে, তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত আছে।" (মুসলিম)

এই হাদীস শরীফের মধ্যে আরো একটি আদব বর্ণিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে, খাওয়ার পর হাত চেটে খাওয়ার সাথে সাথে বরতনও মুছে খেয়ে পরিষ্কার করবে, যাতে আল্লাহ তা'আলার রিজিকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না

পায়। এমনিতেই বরতনে ঐ পরিমাণ খাবার নেবে, যা খেয়ে শেষ করা সম্ভব হবে। অতিরিক্ত নেবে না। এমনভাবে নেবে, যাতে খাওয়ার পর আর অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু তারপরও যদি বরতনে খাবার অতিরিক্ত এসে যায়, এবং তা অবশিষ্ট থেকে যায়, যা খেয়ে শেষ করার অবকাশ থাকে না। সে অবস্থায় অনেকে মনে করে যে, বরতনে নেয়া সবটুকু খাবার আমাকেই খেয়ে শেষ করতে হবে। এমনকি অনেকে তো এটাকে ফরজ-ওয়াজিবও মনে করতে চায়, তাতে পেটে অসুখই হোক না কেন।

মনে রাখা দরকার যে, শরীয়তে এই হুকুম নেই যে, বরতনের সবটুকু খাবার অবশ্যই খেতে হবে; বরং শরীয়তের আসল নিয়ম হলো– প্রথমত অতিরিক্ত খাবার বরতনে নেবে না। কিন্তু যদি কেউ তা করেই ফেলে, তাহলে তা রেখে দেয়ার অবকাশও শরীয়তে রয়েছে। তবে এমনভাবে হবে, যেন তা বরতনের এক পার্শে থাকে। সমস্ত বরতন নোংরা অবস্থায় না থাকে। সুতরাং বরতনের এক পাশ থেকে খেয়ে সেই অংশ পরিষ্কার করে বাকী অংশ রেখে দেবে, যাতে তা অপরকে দেয়া যায় এবং তাতে তার ঘৃণা না জন্মে, অস্বস্তিবোধ না হয়। এই হচ্ছে ইসলামের সঠিক তরিকা।

চামচ দিয়ে খেলে, তখন?

অনেক সময় মানুষ হাত দিয়ে খেতে 'পারে না, তখন তাকে চামচ দিয়ে খেতে হয়। এমতাবস্থায় আঙ্গুল চাটার সুন্নতের উপর সে কিভাবে আমল করবে? আঙ্গুলের মধ্যে তো খাবার লাগেনি।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, কেউ যদি চামচ দিয়ে খায়, তখন চামচে লেগে থাকা খাবার চেটে খাবে যে, নবীজি (সাঃ) বলেছেন, জানি না খাবারের কোন্ অংশে বরকত লেগে আছে। আমার তো আজ হাতে খাবারই লাগেনি, তবে চামচে তো লেগেছে; সুতরাং ঐ চামচটাই চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে দিই। তাহলেই আশা করা যায় যে, ইনশাআল্লাহ সুন্নতের ফজিলত হাসিল হবে।

লোকমা মাটিতে পড়ে গেলে তখন?

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "খাওয়ার সময় যদি কারো লোকমা মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে তার উচিত তা তুলে নেয়া। অতঃপর যদি তাতে কিছু মাটি বা ময়লা লেগে যায়,

তাহলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেবে- শয়তানের জন্য তা ফেলে দেবে না। আর আঙ্গুল চেটে খাওয়ার পূর্বে রুমাল দিয়ে হাত মুছবে না। কেননা, কেউ জানে না যে, তার খাবারের কোন্ অংশে বরকত লুকায়িত আছে।" (মুসলিম)

এই হাদীস শরীফের মধ্যে এ আদবটি লক্ষণীয় যে, কোনো সময় খেতে বসে কোনো লোকমা বা অন্য কিছু মাটিতে পড়ে গেলে তা তুলে পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়া উচিত। অনেক সময় মানুষ তা তুলে নিয়ে খেতে লজ্জা পায়, ইতস্তত করে। এই কারণেই নবীজি (সাঃ) বলে দিলেন, এরূপ করো না। কেননা, এটি আল্লাহ তা'আলার রিজিক, তার দানকে অবজ্ঞা না করে তুলে নিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেল।

অবশ্য যদি তা এমনভাবে পড়ে যায় যে, সম্পূর্ণরূপে মাটি মিশ্রিত হয়ে যায় কিংবা নাপাক বা নোংরা হয়ে যায়, এখন আর তা পরিষ্কার করে খাওয়া সম্ভব নয়, তাহলে ভিন্ন কথা। এটি তখন অপারগতা বলে গণ্য হবে এবং তুলে নেয়ার প্রশ্ন থাকবে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুলে নিয়ে পরিষ্কার করার সম্ভাবনা বাকী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে দেবে না, ফেলে দেবে না। কারণ, এটি আল্লাহ তা'আলার রিজিক। এর কদর করা, সম্মান করা ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার রিজিকের ক্ষুদ্র অংশের সম্মান না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রিজিকের বরকত হাসিল হতে পারে না।

এ ক্ষেত্রেও সেই বাঁধা- অর্থাৎ পড়ে থাকা খাবার তুলে খাওয়া সামাজিকতার খেলাফ মনে করা হয়। ফলে মানুষ তাতে লজ্জাবোধ করে এবং মনে করে যে, আমি যদি তুলে খাই, তাহলে লোকজন আমাকে লোভী বলবে। সুতরাং এ পর্যায়ে একটি ঘটনা উল্লেখ যথাযথ মনে করছি।

হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-এর ঘটনা

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) নবীজি (সাঃ)-এর একজন উচ্চস্তরের জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী ছিলেন। তিনি নবীজি (সাঃ)-এর একজন রহস্যবিদ সাহাবী নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'ছাহিবু ছিররি রাসূল (সাঃ)'।

মুসলমানরা যখন ইরানে কেসরার রাজত্বে আক্রমণ পরিচালনা করেছিল, তখন বাদশা কেসরা মুসলমানদের আলোচনা ও সমঝোতার জন্য দরবারে আহ্বান করেছিলেন। মুসল্যমানদের পক্ষ থেকে এ কাজে হযরত হুজায়ফা ও রিবঈ বিন আমের (রাঃ) মনোনীত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, এই বাদশা কিসরাই তখনকার পৃথিবীর বৃহৎ শক্তি (Super

Power) হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। আর ইরানের সভ্যতা-সংস্কৃতি সমগ্র পৃথিবীতে সুপ্রসিদ্ধ ছিল এবং ভরপুর চর্চা হতো। এমনিতে তখন মাত্র দু'টি সভ্যতাই সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে বেঁচে ছিল। এক রোমীয় সভ্যতা, দুই ইরানী সভ্যতা। কিন্তু ইরানী সভ্যতা তার নিজস্ব গুণে ও বৈশিষ্ট্যে অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিল।

নিজস্ব পোশাক কিছুতেই পরিবর্তন করব না

সাহাবীদ্বয় আলোচনার জন্য রওনা করলেন। একটু পরই কিসরার প্রাসাদে প্রবেশ করবেন। তখন তাদের পরনে ছিল পুরাতন ময়লাযুক্ত সাদামাটা পোশাক। দীর্ঘ সফর করে তারা এখানে পৌঁছেছিলেন বিধায় কিছু ধুলাবালি শরীরে ও কাপড়ে লেগে থাকাও ছিল খুবই স্বাভাবিক।

গেটের পাহারাদার এসব দেখে তাদের থামিয়ে দিল। সে বলল, তোমরা এত বড় বাদশার দরবারে এই পোশাকে যাচ্ছো? অতঃপর সে একটি জুব্বা বের করে দিয়ে বলল, এটা পরিধান করে যাও।

তখন হযরত রিব্‌ঈ বিন আমের (রাঃ) বললেন, বাদশার দরবারে যেতে যদি তারই দেয়া পোশাকে আচ্ছাদিত হতে হয়, তাহলে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা এই পোশাকেই যাবো। এই পোশাকে সাক্ষাৎ করা যদি বাদশার না-মনজুর হয়, তাহলে আমাদেরও তাঁর সাথে সাক্ষাতের অত আগ্রহ নেই। সুতরাং আমরা এখনই ফিরে যাচ্ছি।

তরবারি দেখেছ, বাহুশক্তিও দেখে নাও

পাহারাদার ভেতরে খবর পাঠাল, এক আশ্চর্য ও অদ্ভুত ধরনের মানুষ এরা; আমাদের দেয়া জুব্বা গ্রহণ করতেও রাজি নয়। এই সুযোগে হযরত রিব্‌ঈ বিন আমের (রাঃ) তার ভাঙ্গা তরবারির উপর পেঁচানো টুকরো কাপড় ঠিক করছিলেন। পাহারাদার বলল, দেখি, তোমার তরবারি কেমন? তিনি তরবারিটা তাকে দিলেন। পাহাদার বলল, এই তরবারি দিয়েই কি তোমরা ইরান জয় করতে এসেছ?

হযরত রিব্‌ঈ বিন আমের (রা) বললেন, তোমরা শুধু তরবারি দেখেছ, তরবারি পরিচালনাকারী হাত দেখোনি এখনো। পাহাদার বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে হাতও দেখাও। হযরত রিব্‌ঈ বিন আমের (রা) বললেন, তাই যদি হয়, তাহলে এক কাজ করো, তোমাদের সবচেয়ে শক্ত ও দুর্ভেদ্য

ঢালটি আমার সম্মুখে আনো। তারপর আমার হাত দেখো। তা-ই করা হলো। অর্থাৎ তাদের সবচেয়ে শক্ত লোহার যে ঢালটি ছিল, যার সম্পর্কে ধারণা করা হতো যে, কোন তরবারীই এটিকে টুকরা করতে পারবে না। সেটি আনা হলো।

হযরত রিব্ঈ বিন আমের (রা) বললেন, তোমাদের যে কোন একজন ঢালটি হাতে নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়াও। এক ব্যক্তি ঢাল নিয়ে সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি নিজের ভাঙা তরবারি দ্বারা তাতে এমন এক আঘাত করলেন যে, সাথে সাথে তা দু'টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। উপস্থিত লোকজন এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল। বলল, ঈশ্বর জানেন, এরা কোন্ ধরনের মানুষ!

দারোয়ান ভেতরে খবর পৌঁছাল, এরা এমন মানুষ যে, ভাঙ্গা তরবারি দ্বারা ঢাল দু'টুকরা করে ফেলেছে। এরপর ছাহাবাদ্বয়কে ভেতরে ডেকে পাঠানো হলো।

এই বোকাদের কারণে সুন্নত ছেড়ে দেব?

ভেতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাদের সম্মুখে প্রথমে কিছু খাবার পরিবেশন করা হলো। তারা খেতে শুরু করলেন। খাওয়ার সময় একজনের হাত থেকে কিছু খাবার মাটিতে পড়ে গেল।

নবীজির শিক্ষা হলো, যদি খাবার মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে তা নষ্ট হতে দেবে না। কেননা, এটি আল্লাহর রিজিক। জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তার রিজিকের কোন অংশে বরকত রেখেছেন। এই কারণেই ঐ লোকমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করবে না; বরং তুলে নেবে, এবং যদি তাতে কিছু মাটি-ময়লা লেগে থাকে, পরিষ্কার করে তা খেয়ে নেবে।

হযরত হুজায়ফা (রা)-এর এই হাদীসটি মনে পড়লো এবং তিনি পড়ে যাওয়া লোকমাটা তুলতে হাত নীচের দিকে প্রসারিত করলেন। তাঁর পাশে এক ব্যক্তি বসা ছিল। সে কনুই মেরে বলল, এ কী করছেন আপনি? এ তো পৃথিবীর সুপার পাওয়ার (সর্ববৃহৎ শক্তি) বাদশাহ কিসরার দরবার। আপনারা যদি এখানেও মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকমা তুলে খাওয়ার আমল করেন, তাহলে দরবারে আপনাদের কোনো মূল্যই আর বাকী থাকবে না। আর এরা মনে করবে যে, আপনারা বড় 'না-খাওয়া' ধরনের মানুষ। সুতরাং এটা লোকমা তুলে খাওয়ার জায়গা নয়। আজকের জন্য অন্তত

আমলটি বন্ধ রাখুন।

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) উত্তরে এক মূল্যবান বাক্য উচ্চারণ করলেন, "এই নির্বোধদের কারণে কি আমি আমার প্রিয় নবী (স)-এর সুন্নত ছেড়ে দেব? এরা চাই ভালো বলুক, সম্মান করুক কিংবা অসম্মান করুক। চাই ঠাট্টা-বিদ্রূপই করুক না কেন, আমি তো দু'জাহনের বাদশা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর সুন্নত কিছুতেই ছাড়ব না।" শেষে তিনি ঐ লোকমাটি তুলে নিয়ে (সবার সম্মুখে) খেয়ে ফেললেন।

ইরান বিজেতার কাহিনী শোন

বাদশা কিসরার দরবারে প্রথা ছিল, শুধু তিনিই সিংহাসনে উপবিষ্ট থকবেন আর অন্য সকল দরবারি দণ্ডায়মান থাকবে।

হযরত রিব্‌ঈ বিন আমের (রাঃ) বাদশাকে বললেন, আমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত শিক্ষার অনুসরণ করে চলি। তার শিক্ষায় এরূপ নেই যে, শুধু এক ব্যক্তি বসে থাকবে আর সবাই দাঁড়িয়ে। সুতরাং আমরা এভাবে আলোচনায় বসতে রাজি নই। হয় আমাদের জন্যও বসবার ব্যবস্থা করা হোক; নতুবা বাদশাও আমাদের মতো দাঁড়িয়ে থাকুন। তারপর হবে আলোচনা।

বাদশা যখন দেখলেন, এরা তো আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছে; তখন তিনি নির্দেশ দিলেন এক টুকরো মাটি ওর (রিব্‌ঈ বিন আমের (রাঃ)) মাথায় রেখে ফিরিয়ে দাও। আমি ওদের সাথে কথাই বলব না। তা-ই করা হলো।

এক টুকরো মাটি তার মাথায় তুলে দেয় হলো। দরবার থেকে বের হওয়ার সময় অতি সন্তর্পণে তিনি বললেন, ওহে ইরানের বাদশা! স্মরণ রেখো, আজ তুমি আমার হাতে ইরান রাজ্য তুলে দিলে।

এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন। ইরানের লোকেরা অতিশয় কল্পনাপূজারী ছিল। তারা ভাবল, এ তো আমাদের জন্য কুলক্ষণ সাব্যস্ত হলো। বাদশা তাড়াতাড়ি লোক পাঠালেন, বললেন জলদী ঐ মাটি ফিরিয়ে আনো। কিন্তু রিব্‌ঈ বিন আমের (রা)-কে আর কে ধরে? তিনি তা নিয়ে সোজা মুসলিম শিবিরে ফিরে এলেন। আর এর কারণও সুস্পষ্ট। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো ঐসব ভাঙা তরবারি বহনকারীদের হাতেই ইরানের পরাজয় সুনিশ্চিত করে রেখেছেন।

কিসরার অহংকার ধূলি–ধূসরিত হলো

এখন চিন্তা করে বলুন, সুন্নতের উপর আমল করে তাঁরা কি তাদের সম্মান আদায় করে নিতে পেরেছিলেন, না আমরা আজ সুন্নত ছেড়ে দিয়ে আমাদের সম্মান আদায় করে নিতে পারছি?

তাঁরাই আসলে তাদের সম্মান আদায় করে নিতে পেরেছিলেন এবং তা এমনভাবে, যার কোনো তুলনা নেই। একদিকে মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকমা তুলে খাচ্ছে, আর অপর দিকে তাদের ঐসব বিলাসী ব্যবস্থা, যা অহংকারের মূর্তপ্রতীকে পরিণত হয়েছিল, তা এমনভাবে মাটির সাঙ্গে মিশে গেল যে, নবীজির ভাষায় "কিসরার মৃত্যুর পর আর কখনো কোনো কিসরার আবির্ভাব হবে না।"

তাই তো আজ দুনিয়া থেকে তাদের নাম-চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে।

যাই হোক, (ঘটনার শিক্ষা) খাবার মাটিতে পড়ে গেলে তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলা উচিত। লজ্জাবশত এই সুন্নতটি ছেড়ে দেয়া উচিত নয়; বরং আমল করাই কর্তব্য।

অবজ্ঞার ভয়ে সুন্নত ছেড়ে দেয়া কখন বৈধ?

বিষয়টি পূর্বে কিছুটা আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ যদি এমন কোনো সুন্নত পাওয়া যায়, যা ছেড়ে দেয়া গুনাহ নয়। আর সেটা তখনই হতে পারে যখন আশঙ্কা হয় যে, যদি এই সুন্নতটির উপর আমল করতে গেলে বে-ফিকির ও মুক্ত মনের মুসলমানগণ হাসি-মজাক করে কুফ্রি কিংবা ইরতিদাদ তথা ধর্মত্যাগের শিকার হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ঐ সুন্নতটির উপর আমল করা থেকে বিরত থাকা বৈধ হবে।

উদাহারণত মাটিতে বসে খানা খাওয়া সুন্নতের অধিকতর নিকটবর্তী। কখনো যদি আপনাকে হোটেলে কিংবা রেস্তরাঁয় খেতে হয়, যেখানে চেয়ার-টেবিল ভিন্ন আর কোনো উপায় থাকে না। এখন যদি আপনি সুন্নতের উপর আমল করেত গিয়ে নিজের রুমাল বিছিয়ে মাটিতে বসে পড়েন, আর এ প্রকৃতির মুসলমানগণ সুন্নতের উপর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে গিয়ে কুফুরি বা এরতিদাদের শিকার হয়ে পড়ে, তাহলে উত্তম হলো আপাতত ঐ সুন্নতটি ছেড়ে দিয়ে চেয়ার-টেবিলে বসে খেয়ে নেবেন।

স্মরণ রাখতে হবে, এ বিধান সেই পরিস্থিতির জন্য যখন, ঐ সুন্নতটি ছেড়ে দেয়ার বৈধতা প্রমাণিত থাকবে। কিন্তু যেখানে সুন্নতটি ছেড়ে দেয়ার

বৈধতা প্রমাণিত থাকবে না, কিংবা কমপক্ষে কাজটা মোবাহ স্তরেরও হবে না, সেখানে কারো হাসি-মজাকের ভয়ে সুন্নত ছেড়ে দেয়া বৈধ হবে না।

আরো স্মরণীয় যে, মুসলামান ও কাফেরের বিধান এক নয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রেই শুধু সুন্নতের উপর বিদ্রূপ করলে কাফের বা মুরতাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে তো তেমনটি নয়। ওরা তো পূর্ব থেকেই কাফের হয়ে আছে। ওদের সম্মুখে সুন্নত ছেড়ে দেয়া কিছুতেই বৈধ হবে না।

খাওয়ার সময় মেহমান এলে তখন?

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। আর দু'জনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।" (মুসলিম)

এ হাদীসটির মধ্যে এই মূলনীতিটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি খানা খেতে বসার পর কোনো মেহমান কিংবা ভিক্ষুক এসে উপস্থিত হয়, তখন ঐ মেহমান কিংবা ভিক্ষুককে শুধু এই কারণেই ফিরিয়ে দেয়া ঠিক হবে না যে, খাবার তো মাত্র একজনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এখন যদি তাকে এই খাবারে শরীক করা হয়, তাহলে কম পড়ে যাবে; বরং স্মরণ করতে হবে, তখন নবীজির এই হাদীসটি– যেখানে বলা হয়েছে যে, একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট হয়। সুতরাং তাকে বিমুখ করা ঠিক হবে না। বরং খানায় শরীক করে নেয়া উচিত হবে আর এরই ফলে আল্লাহ তা'আলা ঐ খাবারে বরকত দান করবেন।

আর যখন একজনের খানা দুই জনের জন্য যথেষ্ট হয়, তখন স্বভাবতই দু'জনের খানা চার জনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং চার জনের খানা আটজনের জন্য যথেষ্ট হবে।

ভিক্ষুককে ধমক দিয়ে তাড়াবে না

আমাদের সমাজে বর্তমানে প্রথা চালু হয়ে গেছে যে, মেহমান শুধু তাকেই মনে করা হয়, যে আমাদের সমমানের অথবা যার সাথে পূর্বপরিচয় রয়েছে, কিংবা যার সাথে বন্ধুত্ব-হৃদ্যতা রয়েছে, অথবা যারা আত্মীয়স্বজন। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও নিজের সমমান ও সমমর্যাদাসম্পন্ন হলে তবেই সে আসল মেহমান। আর যে ব্যক্তি অপরিচিত-মুসাফির, অসহায়-মিসকীন,

তাকে কেউ মেহমান মনে করে না। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, এই ব্যক্তিও আল্লাহ তা'আলার পাঠানো মেহমান। এই ব্যক্তির সম্মান করাও প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব।

সুতরাং খাওয়ার সময় যদি এই প্রকারের মেহমান এসে যায়, তাকেও তাতে শরীক করে নেয়া উচিত; তাকে ফিরিয়ে দেয়া ঠিক নয়। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, খাওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি এসে গেলে তাকে মোটেই খালি হাতে ফেরাবে না। কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করবে। আর তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া সর্বাবস্থায় পরিহার করতে হবে। কুরআনের ভাষায়– "কোনো প্রার্থীকে কখনো ধমকাবে না।"

সুতরাং সর্বদাই চেষ্টা রাখতে হবে, যাতে কাউকে ধমকাবার অবকাশ না ঘটে। কেননা, এতে অনেক সময় মানুষ সীমালংঘন করে ফেলে। আর তাতে অনেক দুঃখজনক ও অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

হযরত থানবী (রহঃ) তার মওয়ায়েজের মধ্যে একটি ঘটনা লিখেছেন যে, এক ধনী ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে বসে খাচ্ছিলেন। খাবারও ছিল খুবই উন্নত। এ কারণে খুবই আগ্রহ নিয়ে তারা খেতে বসেছেন। এমন সময় এক ভিক্ষুক দরজায় এসে দাঁড়ালে এটা তাদের অপছন্দ হলো। ফলে ভিক্ষুককে খুব ধমকিয়ে অপদস্ত করে তাড়িয়ে দিল (আল্লাতায়ালা হেফাজত করুন)।

কখনো কখনো মানুষের দু'একটি আমল এমন হয়ে যায় যে, তা আল্লাহর গজবকে ডেকে আনে। যাই হোক, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঐ দম্পতির মধ্যে অমিল শুরু হলো। এমনকি বিচ্ছেদের মতো তিক্ত ঘটনা ঘটল। স্ত্রী বাপের বাড়ী ফিরে এসে ইদ্দতে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করল। এরপর তার অন্যত্র দ্বিতীয়বারের মতো বিবাহ হলো।

এই দ্বিতীয় স্বামীও ছিল ধনী। একদা তারা দু'জন খেতে বসল। এমন সময় একজন ফকীর দরজায় এসে দাঁড়াল। স্ত্রী বলল, আমি ইতিপূর্বে এভাবে এক দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম।

আমার ভয় হয়, পাছে আবার আল্লাহর কোনো গজব পতিত হয় কিনা। সুতরাং আগে এই ফকীরকে কিছু দিয়ে আসি। স্বামী বলল, ঠিক আছে, আগে ওকেই দিয়ে আস।

স্ত্রী দরজায় অপেক্ষমান ফকীরকে কিছু দিতে গিয়ে লোকটাকে দেখে চমকে ওঠে– এ যে তার পূর্ব স্বামী! ত্বরিত ফিরে গিয়ে বর্তমান স্বামীকে বলল, দরজায় তো আজ এক আশ্চর্য বিষয় দেখে এলাম। এই ফকীর যে আমার পূর্ব স্বামী। যে ছিল খুব ধনী ও বিত্তবান। আমি আর সে একবার খেতে বসেছিলাম, তখন দরজায় একজন ভিক্ষুক এসেছিল। তাকে সে ধমকিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, যার ফলে আজ তার এই অবস্থা।

স্বামী তাকে বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনা শোনাব কি? স্ত্রী বলল, নিশ্চয়। স্বামী বলল, তোমাদের দরজার সেদিনকার সেই ফকীরটি ছিলাম আমি।

আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির ধন-দৌলত এই ব্যক্তিকে দিয়েছেন। আর এই ব্যক্তির অভাব-অনটন ঔ ব্যক্তির স্কন্ধে ঝুলিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যাবতীয় মন্দ অবস্থা থেকে হেফাজত করুন। নবীজি (সাঃ), আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে দু'আ করেছেন- "হে খোদা! সচ্ছলতার পর অসচ্ছলতার হাত থেকে তোমারই আশ্রয় চাই।"

যাই হোক, যে কোনো ধরনের প্রার্থীকে ধমকিয়ে তাড়িয়ে দেয়া উচিত নয়। অবশ্য কোনো কোন সময় এমন পরিস্থিতি এসে যায় যে, তখন ধমকাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উলামায়ে কেরাম (বিশেষ সতর্কতার সাথে) এর অনুমতি দান করেছেন। তবু যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবে, যাতে ঐ পর্যায় পৌঁছাবার প্রয়োজনই না হয়; বরং প্রথমেই কিছু দিয়ে বিদায় করে দেবে।

হাদীসের আরেক মর্ম এই যে, করোরই খাবারের পরিমাণ এত সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত নয়, যা তার স্বাভাবিক অভ্যাস এবং যা তার প্রকৃত প্রয়োজন; বরং এমন অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত, যাতে প্রয়োজন কম-বেশি হলে সমস্যা না হয়।

কেননা, নবীজী (সঃ) এরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তির খাবার দুই ব্যক্তির জন্য আর দুই ব্যক্তির খাবার চার ব্যক্তির এবং চার ব্যক্তির খাবার আট ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হয়। সুতরাং এর উপর আমল করতে হলে কখনো একটু কম খাওয়ার অবকাশ ঘটবে। তাই এর অভ্যাস পূর্ব থেকেই থাকা চাই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিজ রহমতে এই সত্যকে উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ)-এর ইরশাদ

যাই হোক, খাওয়ার প্রায় অধিকাংশ সুন্নতের উল্লেখ সমাপ্ত হলো। এতদিন যদি এগুলোর উপর আমল না হয়ে থাকে, তাহলে এখন থেকেই আমল করার নিয়ত করে নিন।

বিশ্বাস রাখি, আল্লাহ তা'আলা সুন্নতের এত্তেবা'র মধ্যে যে নূর, যে রুহ এবং যে সকল বিস্ময়কর উপকারিতা রেখেছেন, তা এইসব ছোট ছোট সুন্নতের উপর আমল করার দ্বারাও হাসিল হয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ)-এর এরশাদ বারবার শোনার মতো। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যাবতীয় জাহেরী এলেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। হাদীস-তাফসীর-ফেকাহ– মোটকথা সকল জাহেরী এলেমই আমি প্রাপ্ত হয়েছি। আর এতে আমি অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেছি। এরপর আমার ইচ্ছা জাগল যে, এবার দেখা উচিৎ সাধকগণ কী বলেন, কী প্রচার করেন। ফলে তাদের প্রতি মনোনিবেশ করে তাদের যাবতীয় এলেম হাসিল করলাম।

সুফী সম্প্রদায়ের চার তরীকা– সোহরাওয়ারদীয়া, কাদেরিয়া, চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া এদের কার কী শিক্ষা, এ বিষয়ে জানার আগ্রহ হলো। সবার দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছলাম। এদের যাবতীয় কাজ-কর্ম, ব্যস্ততা ও জিকির-আজকার এবং মুরাকাবা-মুশাহাদা ও চিল্লা সব শেষ করলাম।

এতসব কিছু করার পর আল্লাহ তা'আলা আমাকে এত উচ্চ মাকাম দান করলেন যে, খোদ নবীজী (সঃ) আমাকে স্বহস্ত মোবারকে 'খালআ' পড়ালেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরো উঁচু মাকাম দান করলেন। ফলে আমি 'আসল' পর্যন্ত পৌঁছলাম। অতঃপর সেখান থেকে 'জিল্লা' পর্যন্ত পৌঁছলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন স্থানে পৌঁছালেন যে, যদি তা মুখে প্রকাশ করি, তাহলে উলামায়ে জাহেরীগণ আমার উপর যিন্দিকের ফতোয়া আরোপ করবে।

কিন্তু আমার করার কী আছে? আল্লাহ তা'আলা সত্যি সত্যিই আমাকে তাঁর একান্ত অনুগ্রহে এইসব স্তর ও মর্যাদা দান করেছেন। এখন আমি এতসব কিছু অর্জন করার পর একটি দু'আ সর্বদা করে থাকি। আর যে ব্যক্তি এই দু'আর ওপর 'আমীন' বলবে, আল্লাহ তা'আলা তাকেও ক্ষমা করে দেবেন।

দু'আটি এই–

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে নবী করিম (সঃ)-এর সুন্নতের এত্তেবা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।"

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে নবী করিম (সঃ)-এর সুন্নতের ওপর জীবিত রাখুন। আমীন।"

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে নবী করিম (সঃ)-এর সুন্নতের উপর মৃত্যু দান করুন। আমীন।"

সুন্নতের মতো জীবন গড়ি

সারা দুনিয়া ঘুরেফিরে সবশেষে এ কথাই স্বীকার করতে হবে যে, যা কিছু লাভ হবে, তা নবী করিম (সঃ)-এর সুন্নতের বদৌলতেই লাভ হবে।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) বললেন, আমি সবকিছু ঘুরেফিরে তারপর ঐ স্তরে পৌঁছেছি। আর তোমরা প্রথম দিবসেই ঐ স্তরে পৌঁছে যেতে পারো। তোমরা শুধু এ কথার ফায়সালা করে নাও যে, নবীজীর (সঃ) যাবতীয় সুন্নতের উপর আজ থেকেই আমল করবে। তাহলে এই প্রথম দিন থেকেই সুন্নতের বরকত, সুন্নতের নূর স্বচক্ষে দেখতে পারে। তারপর দেখো, জীবনের স্বাদ ও আনন্দ কিরূপ।

স্মরণ রেখো, অন্যায় ও অপরাধ কর্মে জীবনের কোনো স্বাদ ও আনন্দ নেই। গোনাহ ও পাপাচারে জীবনের কোনো মজা ও মূল্য নেই। জীবনের স্বাদ তাদের জিজ্ঞাসা করো, যারা জীবনটাকে সুন্নতের ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জীবনের যে স্বাদ ও স্ফুর্তি আমাদের দান করেছেন, এসব রাজা-বাদশা যদি তা অনুধাবন করতে পারত, তাহলে তারা তরবারী উঁচিয়ে এসে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত, যাতে তারাও তা পেয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবনে এমন শান্তি ও প্রফুল্লতা দান করেছেন। কিন্তু শর্ত একটিই– এ পথ অবলম্বন করতে হবে। এ পথে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আপন অনুগ্রহে ও রহমতে সুন্নতের এত্তেবা করার তাওফীক দান করনে। আমীন।

সমাপ্ত